লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

বংশগতি (heredity) বলে। একে জেনেটিক ট্রান্সমিশন (genetic transmission)ও বলা হয়। জেনেটিক ট্রান্সমিশন হলো বংশগতির সমনাম। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে বংশগতিবিদ্যা (genetics) বলে।

যেসব বস্তুর মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয় তাদেরকে একত্রে বংশগতি বস্তু (hereditary material) বলা হয়। বংশগতীয় বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমে রয়েছে DNA, যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক যা পর্যায়ক্রমে বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে। নিচে এগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)

১৮৬৯ সালে সুইস চিকিৎসক ও রসায়নবিদ **Friedrich Miescher** (মিশার) ক্ষতস্থানের পূঁজের শ্বেতরক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থেকে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করেন এবং নামকরণ করেন নিউক্লিন (nuclein)। নিউক্লিন শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে ভিন্নধর্মী। ১৮৮৯ সালে অল্টম্যান (Altman) নিউক্লিনে অ্যাসিডের ধর্ম দেখতে পান এবং তিনি এর নামকরণ করেন নিউক্লিক অ্যাসিড। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী **Albrecht Kossel** নিউক্লিক অ্যাসিডের দু'ধরনের নাইট্রোজেন বেস–পিউরিন ও পাইরিমিডিন এবং শ্যুগার ও ফসফোরিক অ্যাসিড শনাক্ত করেন। এজন্য তাঁকে ১৯১০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজ্ঞানী **Lavine** ১৯২১ সালে DNA ও RNA নামে দু'ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন।

নিউক্লিক অ্যাসিড কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস মৌল নিয়ে গঠিত। নিউক্লিক অ্যাসিডে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১৫% এবং ফসফরাসের পরিমাণ ১০%।

জীবকোষে দু'প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। এদের একটি DNA এবং অপরটি হলো RNA। DNA সাধারণত নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনে থাকে। RNA-এর শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায় সাইটোপ্লাজমে এবং বাকি ১০ ভাগ পাওয়া যায় নিউক্লিয়োলাসে।

নিউক্লিক অ্যাসিড কী? নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিয়েজ এনজাইম বা মৃদু ক্ষার দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড। কাজেই বলা যায়, নিউক্লিয়োটাইডগুলোর পলিমার সৃষ্টির মাধ্যমে গঠিত অ্যাসিডের নাম হলো নিউক্লিক অ্যাসিড। আবার নিউক্লিয়োটাইডকে মৃদু অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিড। এভাবেও বলা যায়, **নিউক্লিক অ্যাসিড হলো নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাসিড যা জীবের বংশগতির ধারাসহ সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।** এগুলো কোষের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক অণু। নিউক্লিক অ্যাসিড বংশগতির সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে এদের মাস্টার মলিকিউল (master molecule) বলে।

নিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদান: নিউক্লিক অ্যাসিডকে হাইড্রোলাইসিসের পর নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ পাওয়া যায়।

১। পেন্টোজ শ্যুগার, ২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, ৩। ফসফোরিক অ্যাসিড।

১। পেন্টোজ শ্যুগার (Pentose sugar) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শ্যুগার (চিনি)-কে বলা হয় পেন্টোজ শ্যুগার। নিউক্লিক অ্যাসিডে দু'ধরনের পেন্টোজ শ্যুগার থাকে। এর একটি রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যটি ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। RNA-তে রাইবোজ শ্যুগার এবং DNA-তে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার থাকে। পেন্টোজ শ্যুগার ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাস্টার গঠনে সক্ষম। রিং স্ট্রাকচারবিশিষ্ট β-D রাইবোজ অথবা β-D ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করে।

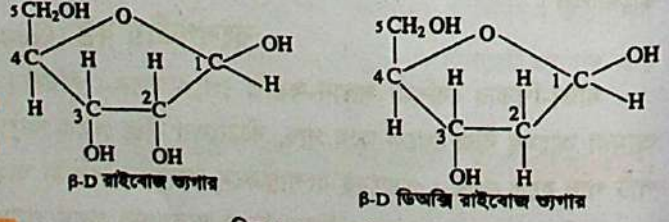

চিত্র ১.২১ : পেন্টোজ শ্যুগার।

রাইবোজ এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার প্রায় একই রকম গঠনবিশিষ্ট, পার্থক্য শুধু এই যে, **ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের ২নং কার্বনে অক্সিজেন অনুপস্থিত** (ডিঅক্সি = অক্সিজেন ছাড়া)। রাইবোজ শ্যুগার দিয়ে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার দিয়ে ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) গঠিত হয়।

২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (Nitrogenous base) : নিউক্লিক অ্যাসিডে দুই প্রকার নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে এই ক্ষরকসমূহ গঠিত। ক্ষারকগুলো এক রিং বিশিষ্ট বা দুই রিং বিশিষ্ট হতে পারে। এই রিং এর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্ষারক দুই প্রকার; যথা-(i) পিউরিন এবং (ii) পাইরিমিডিন।

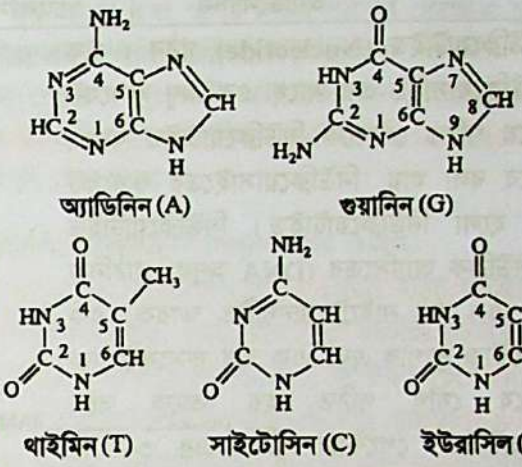

চিত্র ১.২২ : পিউরিন (অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন) এবং পাইরিমিডিন (থাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল)।

(i) পিউরিন (Purine) : দুই রিংবিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পিউরিন। এর সাধারণ সংকেত হলো $C_5H_4N_4$। নিউক্লিক অ্যাসিডে দু'প্রকার পিউরিন ক্ষারক থাকে, যথা- অ্যাডিনিন (Adenine) এবং গুয়ানিন (Guanine)।

(ii) পাইরিমিডিন (Pyrimidine) : এক রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পাইরিমিডিন। এর সাধারণ সংকেত হলো $C_4H_4N_2$। নিউক্লিক অ্যাসিডে তিন প্রকার পাইরিমিডিন ক্ষারক থাকে, যথা- থাইমিন (Thymine), সাইটোসিন (Cytosine) এবং ইউরাসিল (Uracil)। ইউরাসিল কেবল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডে (RNA) থাকে। থাইমিন কেবল ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিডে (DNA) থাকে। **(মনে রাখতে হবে নাম বড় যার গঠন ছোট তার।)**

ক্ষারকসমূহের নামকরণ : অ্যাডিনিন এবং থাইমিন-এর নামকরণ করা হয়েছে **থাইমাস** (Thymus) থেকে। থাইমাস গ্ল্যান্ড থেকে এদেরকে প্রথম পৃথক করা হয়েছিল। এডিনো অর্থ হলো গ্ল্যান্ড (gland)। সাইটোসিন-এর নাম এসেছে সাইটো (cyto) থেকে; সাইটো অর্থ হলো সেল (cell)। গুয়ানিন-এর নাম এসেছে গুয়ানো (guano) থেকে। গুয়ানো অর্থ হলো বাদুর বা সীবার্ড এর পড়ন্ত মল (fecal dropping)। সাধারণত ক্ষারকগুলো বর্ণমালা **'AGTCU'** দ্বারাই পরিচিত।

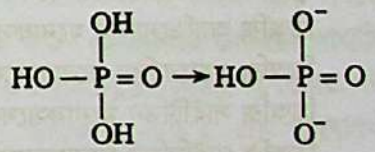
(H_3PO_4)
ফসফোরিক অ্যাসিড

৩। ফসফোরিক অ্যাসিড (Phosphoric acid) : নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি অন্যতম উপাদান হলো ফসফোরিক অ্যাসিড। এর আণবিক সংকেত H_3PO_4। এতে তিনটি একযোজী হাইড্রক্সিল গ্রুপ এবং একটি দ্বিযোজী অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, যেগুলো পাঁচযোজী ফসফরাস পরমাণুর সাথে সংযুক্ত।

নিউক্লিয়োসাইড (Nucleoside) গঠন : এক অণু নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক ও এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার যুক্ত হয়ে গঠিত গ্লাইকোসাইড যৌগকে বলা হয় নিউক্লিয়োসাইড। ক্ষারক পাইরিমিডিন হলে তাকে বলা হয় পাইরিমিডিন নিউক্লিয়োসাইড, আর ক্ষারক পিউরিন হলে তাকে বলা হয় পিউরিন নিউক্লিয়োসাইড। পাইরিমিডিন নিউক্লিয়োসাইডে ক্ষারকের (T/C/U) ১নং নাইট্রোজেন, পেন্টোজ শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত থাকে। কিন্তু পিউরিন নিউক্লিয়োসাইডে ক্ষারকের (A/G) ৯নং নাইট্রোজেন (১নং নয়) পেন্টোজ শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত থাকে।

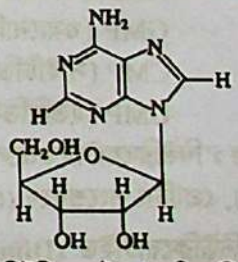
চিত্র ১.২৩ : নিউক্লিয়োসাইড (অ্যাডিনোসিনের গঠন)।

বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়োসাইড :

পেন্টোজ শ্যুগার	অ্যাডিনিন (A)	গুয়ানিন (G)	ইউরাসিল (U)	সাইটোসিন (C)	থাইমিন (T)
রাইবোজ	অ্যাডিনোসিন	গুয়ানোসিন	ইউরিডিন	সাইটিডিন	–
ডিঅক্সিরাইবোজ	ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন	ডিঅক্সি গুয়ানোসিন	–	ডিঅক্সি সাইটিডিন	ডিঅক্সি থাইমিডিন

নিউক্লিয়োটাইড (Nucleotide) গঠন : এক অণু নিউক্লিয়োসাইড-এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগকে নিউক্লিয়োটাইড বলে। অন্যভাবে বলা যায়, নিউক্লিয়োসাইডের ফসফেট এস্টার হলো নিউক্লিয়োটাইড। নিউক্লিয়োটাইড হলো নিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA অণুর) গাঠনিক একক। এক অণু নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার এবং এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয় তাকে বলে নিউক্লিয়োটাইড। পেন্টোজ শ্যুগার-এর ৩নং ও ৫নং কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়।

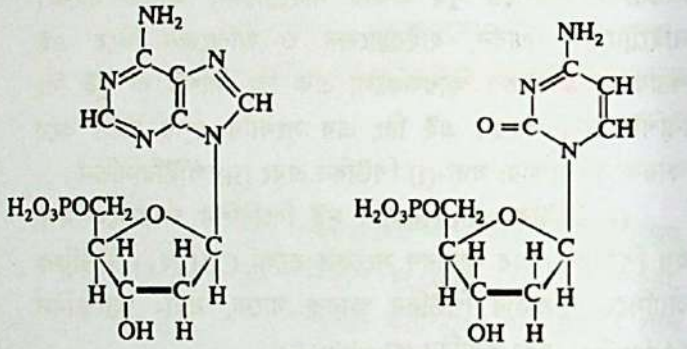

dAMP (ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) dCMP (ডিঅক্সি সাইটিডিন মনোফসফেট)

চিত্র ১.২৪ : দুটি নিউক্লিয়োটাইড : dAMP ও dCMP।

বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়োটাইড

শ্যুগার রাইবোজ হলে :

অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = AMP = অ্যাডিনিন নিউক্লিয়োটাইড (অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)
গুয়ানোসিন মনোফসফেট = GMP = গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড (গুয়ানিলিক অ্যাসিড)
সাইটিডিন মনোফসফেট = CMP = সাইটোসিন নিউক্লিয়োটাইড (সাইটিডিলিক অ্যাসিড)
ইউরিডিন মনোফসফেট = UMP = ইউরাসিল নিউক্লিয়োটাইড (ইউরিডিলিক অ্যাসিড)

শ্যুগার ডিঅক্সিরাইবোজ হলে :

ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = dAMP = অ্যাডিনিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি গুয়ানোসিন মনোফসফেট = dGMP = গুয়ানিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সিগুয়ানিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি সাইটিডিন মনোফসফেট = dCMP = সাইটোসিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি সাইটিডিলিক অ্যাসিড)
ডিঅক্সি থাইমিডিন মনোফসফেট = dTMP = থাইমিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি থাইমিডিলিক অ্যাসিড)

অর্থাৎ ক্ষারকের (বা নিউক্লিয়োসাইডের) নামানুসারে নিউক্লিয়োটাইডের নামকরণ করা হয়।

একটি নিউক্লিয়োটাইডে একটি ফসফেট যুক্ত থাকে। এর সাথে আরও এক বা একাধিক ফসফেট যুক্ত হতে পারে। এভাবে ফসফেট সংযুক্তির মাধ্যমে AMP (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) থেকে ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট), আবার ADP থেকে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) সৃষ্টি হয়।

AMP (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) + P = ADP; ADP + P = ATP
GMP (গুয়ানোসিন মনোফসফেট) + P = GDP; GDP + P = GTP
CMP (সাইটিডিন মনোফসফেট) + P = CDP; CDP + P = CTP
UMP (ইউরিডিন মনোফসফেট) + P = UDP; UDP + P = UTP

কাজ : নিউক্লিয়োটাইডগুলো DNA ও RNA তৈরির মূল কাঠামো গঠন করে। এছাড়া মধ্যবর্তী বিপাকে (NAD^+ এবং $NADP^+$), প্রোটিন সংশ্লেষণে (GTP), শ্বসনে (ATP), ফসফোলিপিড সংশ্লেষণে (CTP) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডাইনিউক্লিয়োটাইড (Dinucleiotide) : একটি নিউক্লিয়োটাইড যখন আরেকটি নিউক্লিয়োটাইডের সাথে ফসফো-ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয় তখন তাকে ডাইনিউক্লিয়োটাইড বলে। ১ম নিউক্লিয়োটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৫নং কার্বনের সাথে এবং ২য় নিউক্লিয়োটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৩নং কার্বন ফসফেট ডাই-এস্টার বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়, ফলে একটি ডাইনিউক্লিয়োটাইড গঠিত হয়।

পলিনিউক্লিয়োটাইড (Polynucleiotide) : অনেকগুলো নিউক্লিয়োটাইড ৫′→৩′ অনুমুখী হয়ে পরস্পর ফসফো-ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি লম্বা রৈখিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিনিউক্লিয়োটাইড বলে। পলিনিউক্লিয়োটাইড একটি চেইন-এর মতো গঠন সৃষ্টি করে। এই চেইন-এ ফসফেট অণু একদিকে পেন্টোজ শ্যুগার (রাইবোজ অথবা ডি-অক্সিরাইবোজ) -এর ৫নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপর দিকে পাশের পেন্টোজ শ্যুগার-এর ৩নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। **DNA অণুর প্রতিটি একক হেলিক্স একটি পলিনিউক্লিয়োটাইড চেইন।**

নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকার : নিউক্লিক অ্যাসিডে বিদ্যমান পেন্টোজ শ্যুগারটি রাইবোজ, না ডিঅক্সিরাইবোজ তার ওপর ভিত্তি করে নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার; যথা—(১) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA এবং (২) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

ডিঅক্সিবাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA = Deoxyribonucleic Acid)

DNA হলো Deoxyribonucleic acid-এর অ্যাক্রোনিম (acronym) বা সংক্ষিপ্ত রূপ। DNA হলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। DNA-এর গঠন একক হলো নিউক্লিয়োটাইড এবং লক্ষ লক্ষ নিউক্লিয়োটাইড-এর দীর্ঘ পলিমার হলো একটি DNA অণু। DNA হলো একটি বৃহদাণুর জৈব অ্যাসিড যা **জীবনের আণবিক ভিত্তি** (molecular core of life) হিসেবে স্বীকৃত। DNA—এর গঠন উপাদান হলো পাঁচকার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার (S); অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T) নামক চার ধরনের নাইট্রোজিনাস ক্ষারক এবং ফসফোরিক অ্যাসিড (P)। কোনো নির্দিষ্ট জীবের (যেমন মানুষ) প্রতিটি কোষেই সমপরিমাণ DNA থাকে।

প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো DNA। কতক ভাইরাসে DNA থাকে। DNA সূত্রাকার কিন্তু আদিকোষ, মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে বৃত্তাকার DNA থাকে। কোষে DNA-এর পরিমাণ পিকোগ্রাম (১ পিকো গ্রাম = $১০^{-১২}$ গ্রাম) এককে প্রকাশ করা হয়। মানুষের ডিপ্লয়েড কোষে ৫-৬ পিকো গ্রাম DNA থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে ১০০ গ্রাম DNA-থাকে।

DNA-এর ভৌত গঠন (Physical Structure of DNA)

১৮৬৯ সালে নিউক্লিক অ্যাসিড আবিস্কৃত হবার পর থেকেই এর প্রকৃতি, গঠন উপাদান এবং ভৌত গঠন সম্বন্ধে জানার জন্য বিস্তর গবেষণা শুরু হয়। জার্মান রসায়নবিদ **Robert Feulgen** ১৯১৪ সালে DNA-এর যে রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা **Feulgen staining** নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫০ সালে Erwin Chargaff বিস্তর গবেষণার পর দেখাতে সক্ষম হন যে, কোনো জীবের DNA-তে A এবং T এর পরিমাণ সমান। আবার G এবং C এর পরিমাণও সমান। DNA অণুতে সমপরিমাণ A ও T এবং সমপরিমাণ C ও G থাকার এই নীতিমালাকে বলা হয় **Chargaff's rule.** নাইট্রোজিনাস ক্ষারকের অর্ধেক হবে পিউরিন (A, G) এবং অর্ধেক হবে পাইরিমিডিন (T, C)। একই সময়ে Maurice Wilkins এবং Rosalind Franklin DNA অণুর X-ray ক্রিস্টালোগ্রাফি করে এর ভৌত অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে তারা DNA গঠনকারী আন্তঃঅণুর দূরত্ব 2.0 nm, 0.34 nm এবং 3.4 nm বলে জানান। তাঁরা আরো বলেন যে, সম্ভবত DNA অণু ডাবল স্ট্র্যান্ড (একটি বা তিনটি নয়) এবং এরা বাঁকানো গঠনে বিদ্যমান, যার কারণে আন্তঃঅণুর বিভিন্ন দূরত্ব দেখা যায়।

Watson ও Crick-এর DNA মডেল

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে Watson এবং Crick ইতোমধ্যেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবগত হন :

i. DNA হলো চার প্রকার নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত পলিমার।
ii. জানা হয়ে যায় নিউক্লিয়োটাইডসমূহের রাসায়নিক গঠন।
iii. যেহেতু DNA অম্লীয়, কাজেই ফসফেট গ্রুপ অবশ্যই উন্মুক্ত (exposed) থাকবে।
iv. Chargaff's data অনুযায়ী A-এর সংখ্যা T-এর সমান হবে এবং G-এর সংখ্যা C-এর সমান হবে।
v. Wilkins ও Franklin DNA অণুর X-ray ক্রিস্টালোগ্রাফি করে এর ভৌত অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন এবং আণবিক মাপ 2.0 nm, 0.34 nm, 3.4 nm এবং helix ধারণা।

vi. দুটি পিউরিন বিপরীতমুখী হয়ে পাশাপাশি 2 nm দূরত্বে বসতে পারে না; আবার দুটি পাইরিমিডিন পাশাপাশি বসলে দূরত্ব 2 nm এর কম হবে। কাজেই একটি পিউরিন ও একটি পাইরিমিডিন ডাবল হেলিক্স-এ বিপরীতমুখী হয়ে বসতে হবে, তবেই দুই স্ট্র্যান্ড-এর দূরত্ব 2 nm সমান থাকবে।

vii. A ও T দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয় এবং G ও C তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয়।

viii. দুটি স্ট্র্যান্ড একটি অপরটির সম্পূরক (Complementary), একইরূপ (identical) নয়।

উপরিউক্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে **Watson ও Crick** (J.D. Watson 1928 & Francis H.C. Crick, 1916-2004) ১৯৫৩ সালে DNA অণুর (তার, সিট, স্ক্রু, বল্টু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায়) একটি ভৌত মডেল উপস্থাপন করেন যা পরবর্তীতে সঠিক মডেল হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এই মডেল উদ্ভাবনের কারণে উইলকিন্সসহ তাঁদেরকে ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Watson ও Crick প্রদত্ত ডাবল হেলিক্স মডেল অনুযায়ী DNA অণুর ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় DNA ডবল হেলিক্স গঠনের উপর তাদের প্রস্তাবটি ব্রিটিশ জার্নাল Nature-এ ১ পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন।

(১) DNA অণু দ্বিসূত্রক, বিন্যাস ডান থেকে বাম দিকে ঘুরানো (প্যাঁচানো) সিঁড়ির মতো, যাকে বলা হয় **ডাবল হেলিক্স** (double helix)।

(২) সূত্র দুটি সমদূরত্বে পরস্পর বিপরীতমুখী (একটি 5′→ 3′ কার্বনমুখী এবং অপরটি 3′→ 5′ কার্বনমুখী) হয়ে অবস্থান করে।

(৩) সূত্র দুটি তৈরি হয় ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার (S) ও ফসফেটের (P) পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে।

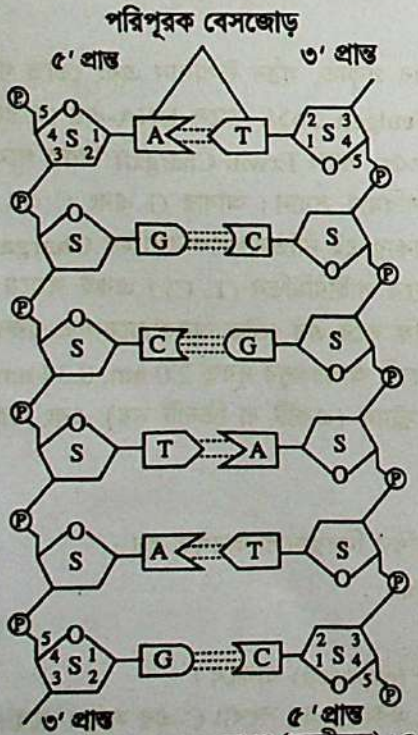

চিত্র ১.২৫ : DNA অণুর একাংশ (সরলীকৃত)। S-শ্যুগার, P-ফসফেট, A, T, G, C = নাইট্রোজিনাস বেস, ... হাইড্রোজেন বন্ড।

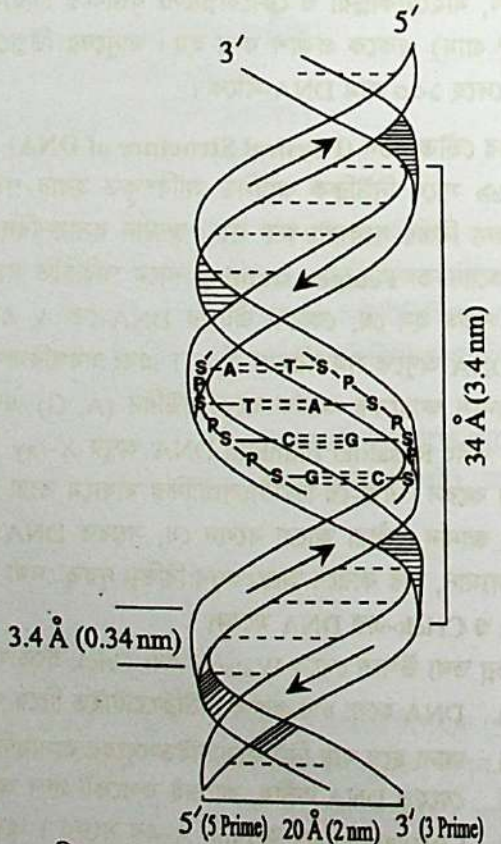

চিত্র ১.২৬ : DNA ডাবল হেলিক্স (ওয়াটসন-ক্রিক মডেল) P-ফসফেট, S-শ্যুগার, A-অ্যাডিনিন, T-থাইমিন, G-গুয়ানিন, C-সাইটোসিন, = হাইড্রোজেন বন্ড।

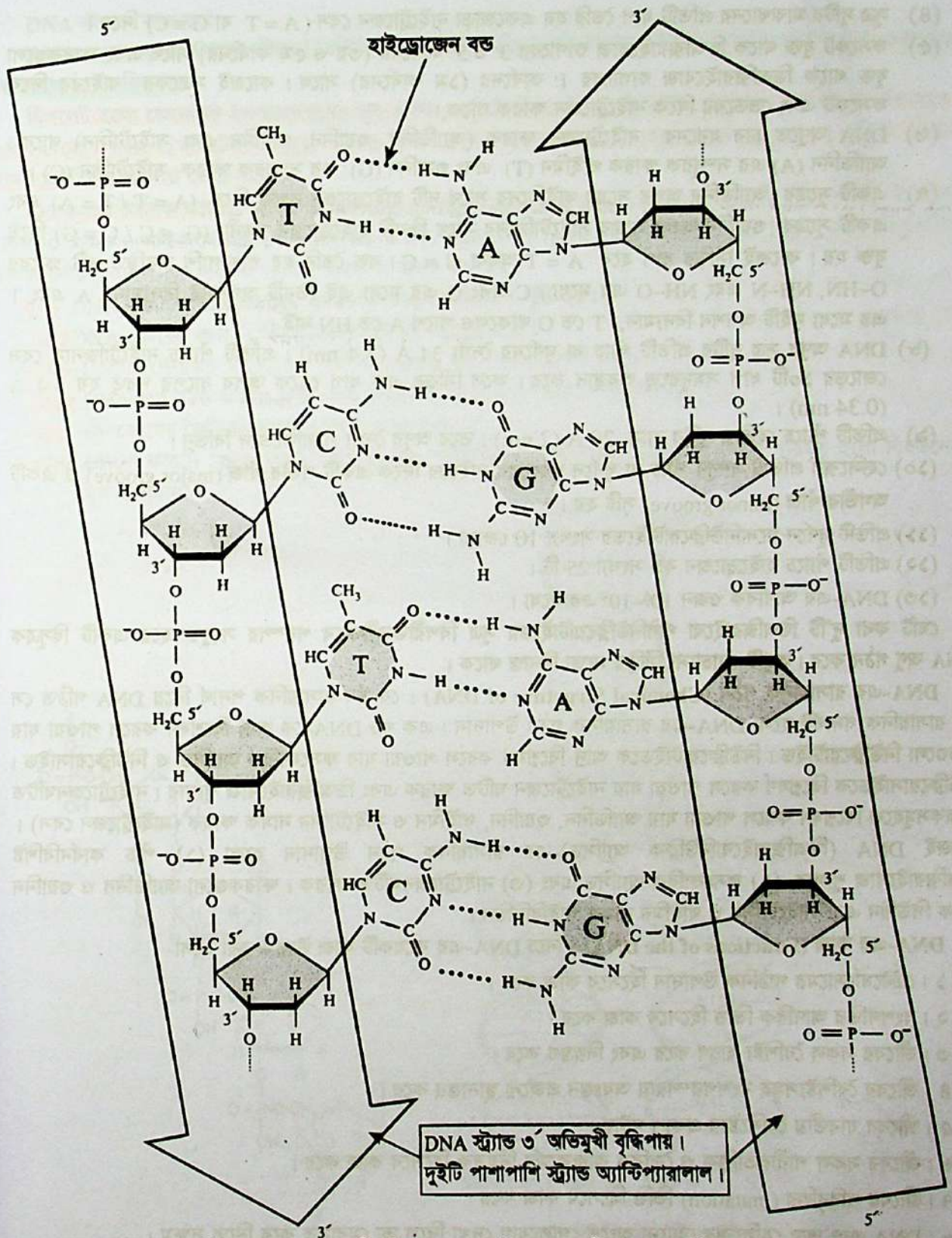

চিত্র ১.২৬ (ক) : দু'টি স্ট্রান্ডের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং এবং অ্যান্টিপ্যারালাল অবস্থান। হাইড্রোজেন বন্ডিং হলো দুটি অণুর মধ্যকার আকর্ষণজনিত আন্তঅণু (intermolecular) বন্ডিং।

(৪) সূত্র দুটির মাঝখানের প্রতিটি ধাপ তৈরি হয় একজোড়া নাইট্রোজেন বেস (A = T বা G ≡ C) দিয়ে।

(৫) ফসফেট যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের 3′ ও 5′ কার্বনের (৩য় ও ৫ম কার্বনের) সাথে এবং ক্ষারকগুলো যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের 1′ কার্বনের (১ম কার্বনের) সাথে। কাজেই সূত্রকের বাইরের দিকে ফসফেট এবং ভেতরের দিকে নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে।

(৬) DNA অণুতে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন) থাকে। অ্যাডিনিন (A) এর সম্পূরক ক্ষারক থাইমিন (T) এবং গুয়ানিন (G) এর সম্পূরক ক্ষারক সাইটোসিন (C)।

(৭) একটি সূত্রের অ্যাডিনিন অপর সূত্রের থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে (A = T / T = A) এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন অপর সূত্রের সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনী (G ≡ C / C ≡ G) দিয়ে যুক্ত হয়। কাজেই সিঁড়ির ধাপ হবে A = T অথবা G ≡ C। বন্ড তৈরি হয় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ক্ষারের O–HN, NH–N এবং NH–O এর মধ্যে। C এবং G এর মধ্যে এই তিনটি অপশনই বিদ্যমান। A এবং T এর মধ্যে দুইটি অপশন বিদ্যমান, T তে O থাকলেও পাশে A তে HN নাই।

(৮) DNA অণুর সূত্র দুটির প্রতিটি প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য 34 Å (3.4 nm)। প্রতিটি প্যাঁচে নাইট্রোজিনাস বেস জোড়ের ১০টি ধাপ সমদূরত্বে অবস্থান করে। ফলে সিঁড়ির এক ধাপ থেকে অপর ধাপের দূরত্ব হয় 3.4 Å (0.34 nm)।

(৯) প্রতিটি প্যাঁচে হেলিক্স দুটির ব্যাস 20 Å (2 nm)। তবে অণুর দৈর্ঘ্য প্রজাতিভেদে বিভিন্ন।

(১০) হেলিক্সের প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাঁচ বা ঘূর্ণনে শৃঙ্খলের বাইরের দিকে একটি **গভীর খাঁজ** (major groove) ও একটি **অগভীর খাঁজ** (minor groove) সৃষ্টি হয়।

(১১) প্রতিটি ঘূর্ণনে মনোনিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা 10 জোড়া।

(১২) প্রতিটি প্যাঁচে হাইড্রোজেন বন্ড সংখ্যা 25 টি।

(১৩) DNA-এর আণবিক ওজন 10^6–10^9 এর মধ্যে।

মোট কথা দু'টি ডিঅক্সিরাইবো পলিনিউক্লিয়োটাইডের সূত্র বিপরীতমুখীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু গঠন করে। অণুটি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে।

DNA-এর রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of DNA) : যে সব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে DNA গঠিত সে সব রাসায়নিক পদার্থই হলো DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান। এক খণ্ড DNA-কে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কতগুলো **নিউক্লিয়োটাইড**। নিউক্লিয়োটাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় **ফসফোরিক অ্যাসিড** ও **নিউক্লিয়োসাইড**। নিউক্লিয়োসাইডকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকসমূহকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নামক ক্ষারক (নাইট্রোজেন বেস)। কাজেই DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো (১) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, (২) ফসফোরিক অ্যাসিড এবং (৩) নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক। ক্ষারকগুলো অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন নামক পিউরিন এবং সাইটোসিন ও থাইমিন নামক পাইরিমিডিন।

DNA-এর কাজ (Functions of the DNA) : নিচে DNA-এর কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হলো-

১। ক্রোমোসোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৩। জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৫। জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৬। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

৭। জীবের পরিবৃত্তির (mutation) ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৮। DNA এবং তার হেলিক্সের কোনো অংশে গোলযোগ দেখা দিলে তা মেরামত করে নিতে সক্ষম।

৯। DNA-অনুলিপন প্রক্রিয়া জীবের জাতিসত্তা অটুট রাখে এবং প্রজাতি শনাক্তকরণে DNA ভূমিকা রাখে।

DNA কীভাবে কাজ করে ?

DNA-র প্রধান কাজ হলো জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। 'জিন' এর মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়।

ট্রিপলেট হলো জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক। প্রতিটি ট্রিপলেট একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড নির্দেশ করে। mRNA-তে, DNA ট্রিপলেটের সম্পূরক পরপর তিনটি বেস সিকোয়েন্সকে বলা হয় কোডন (codon)। প্রতিটি কোডন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড কোড করে।

DNA-এর জৈবিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Biological significance of DNA) : DNA বংশগতি বিষয়ক বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক ও বাহক। অধিকাংশ জীবের বংশগতির একক অর্থাৎ জিন (gene) DNA ছাড়া অন্য কিছুই নয়। নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্যই DNA-কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

(i) DNA দ্বারা কোষ বিভাজনের সময় এক নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়।

(ii) DNA কোষের জন্য নির্দিষ্ট প্রকারের প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

(iii) DNA বংশগতির সব ধরনের জৈবিক সংকেত বহন করার ক্ষমতা রাখে।

(iv) DNA-এর গঠন অত্যন্ত স্থায়ী এবং মিউটেশন ছাড়া এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

(v) জীবকোষের জৈবিক সংকেত প্রেরক হচ্ছে DNA।

(vi) কোনো কারণে DNA অণুর গঠনে কোনো পরিবর্তন হলে পরিবৃত্তির উদ্ভব হয়। আর পরিবৃত্ত হলো বিবর্তনের মূল উপাদান।

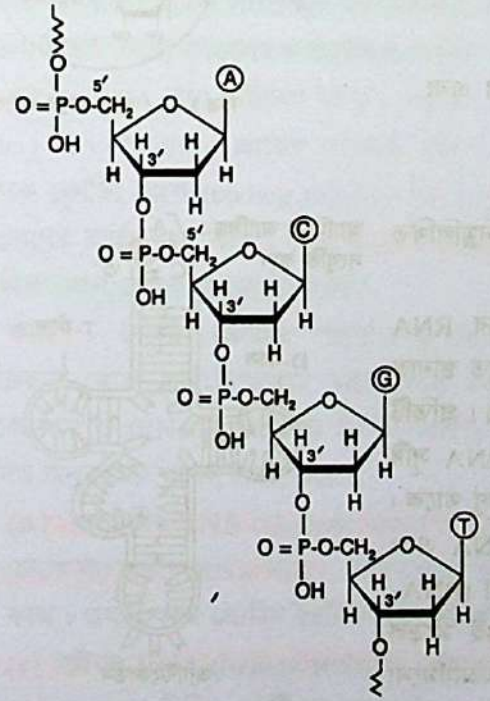

চিত্র ১.২৭ : DNA অণুর একটি শিকলের একাংশ।

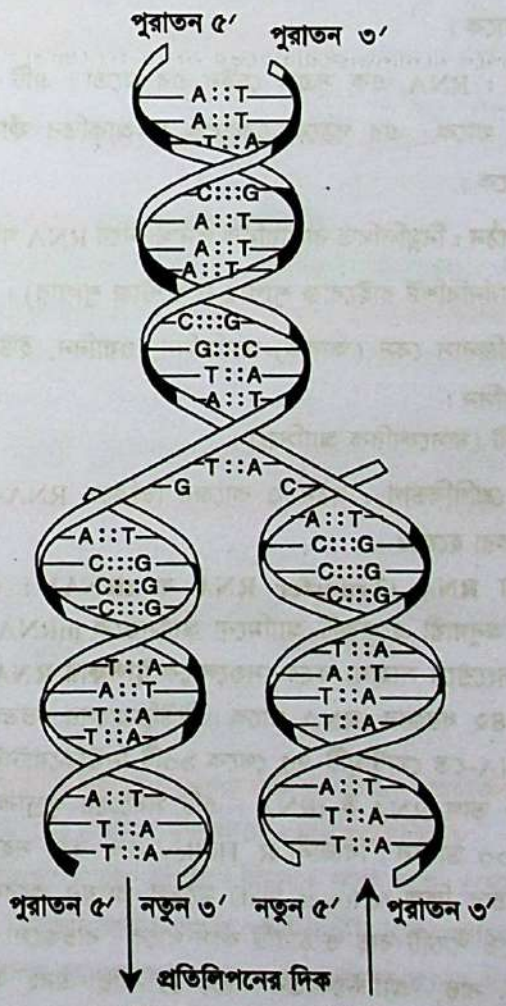

চিত্র ১.২৮ : DNA প্রতিলিপিকরণ। (সরলীকৃত)।

পরিশেষে বলা যায়, DNA-অণু জীবকোষের সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, তাই DNA-ই হলো **'মাস্টার মলিকিউল'** (master molecule)।

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA = Ribonucleic Acid)

RNA হলো Ribonucleic acid এর অ্যাক্রোনিম বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যে নিউক্লিক অ্যাসিডের পলিনিউক্লিয়োটাইডের মনোমার এককগুলোতে গাঠনিক উপাদানরূপে রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যতম বেস (ক্ষারক) হিসেবে ইউরাসিল থাকে, তা হলো **রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (RNA)।

অবস্থান বা বিস্তৃতি : সকল জীব কোষে RNA থাকে। একটি কোষে বিরাজমান RNA এর শতকরা ৯০ ভাগ থাকে সাইটোপ্লাজমে, বাকি ১০ ভাগ নিউক্লিয়াসে। সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিডেও RNA পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়োলাসে এবং DNA-এর সহযোগী হিসেবে ক্রোমোসোমে RNA থাকে। ব্যাকটেরিয়া কোষেও RNA পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু ভাইরাসেও RNA উপস্থিত থাকে।

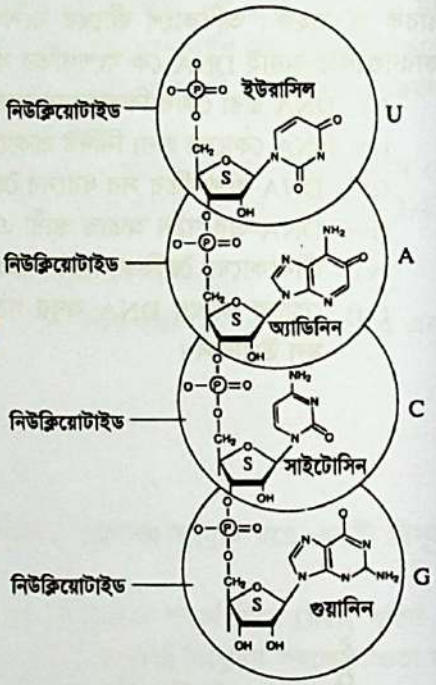

চিত্র ১.২৯ : RNA অণুর একাংশ।

ভৌত গঠন : RNA এক সূত্রক চেইন-এর মতো। এটি স্থানে স্থানে কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। এর গঠনে একাধিক U-আকৃতির ফাঁস (hairpin loop) বা লুপ থাকে।

রাসায়নিক গঠন : নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে RNA গঠিত।

(i) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শ্যুগার (পেন্টোজ শ্যুগার)।

(ii) নাইট্রোজিনাস বেস (ক্ষারক)-অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল এবং সাইটোসিন।

(iii) ফসফেট (ফসফোরিক অ্যাসিড)।

RNA-এর শ্রেণিবিভাগ : গঠন ও কাজের ভিত্তিতে RNA-কে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(i) ট্রান্সফার RNA (Transfer RNA বা tRNA) : যে সব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে সেগুলোকে ট্রান্সফার RNA বলে। প্রতিটি কোষে প্রায় ৩১-৪২ ধরনের tRNA থাকে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে tRNA সৃষ্টি হয়। প্রতিটি tRNA-তে মোটামুটি ৭৫ থেকে ৯০টি নিউক্লিয়োটাইড অণু থাকে। কোষের প্রায় ১৫ ভাগ RNA-ই tRNA। এটি সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার RNA এবং ওজন প্রায় ২৫০০০ ডাল্টন। বিজ্ঞানী R. Holley এবং তার সহকর্মীরা tRNA-এর গঠনের ক্লোভার লিফ (Clover leaf) মডেল প্রণয়ন করেন। এই মডেল অনুযায়ী tRNA-তে পাঁচটি বাহু ও চারটি ফাঁস থাকে। বাহুগুলো হলো-অ্যামিনো অ্যাসিড বাহু, T বাহু, অ্যান্টিকোডন বাহু, D বাহু এবং অতিরিক্ত বাহু। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি tRNA এক সূত্রক এবং লম্বা চেইনের মতো থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন

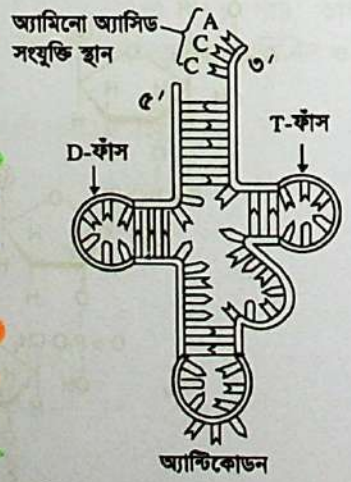

চিত্র ১.৩০ : tRNA-এর ক্লোভার লিফ মডেল।

বেস-এর মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি tRNA-তে একাধিক ফাঁস (loop) সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস হলো অ্যান্টিকোডন ফাঁস যা mRNA-এর কোডন-এর সাথে মুখেমুখে বসে যেতে পারে। tRNA- ৩´ প্রান্ত এক সূত্রক এবং সব সময়ই ACC ধারায় বেস সজ্জিত থাকে। এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত হয়। একে বলা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট। ফাঁস অবস্থায় সব সময়ই অ্যান্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট বিপরীত অবস্থানে থাকে। তিনটি বেস নিয়ে অ্যান্টিকোডন সৃষ্টি হয়।

সব tRNA অণুর বেস সিকুয়েন্স একই রকম নয়। বেস সিকুয়েন্সের এই পার্থক্য এর রাসায়নিক গুণাগুণে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এর উপর ভিত্তি করে সঠিক t RNA অ্যাকটিভেটিং এনজাইম সঠিক অ্যামিনো অ্যাসিড নির্ণয় করে থাকে। বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য বিশটি পৃথক পৃথক tRNA অ্যাকটিভেটিং এনজাইম আছে। tRNA অ্যাকটিভেটিং এনজাইম সঠিক tRNA শনাক্ত করে থাকে tRNA-এর সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও রাসায়নিক ধর্ম দ্বারা। এটি এনজাইম-সাবস্ট্রেট স্পেসিপিসিটির অতি সুন্দর উদাহরণ। tRNA-র সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তি এবং বর্ধিষ্ণু পলিপেপ্টাইডের সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তিতে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে থাকে ATP।

কাজ : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় জেনেটিক কোড অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করা।

(ii) রাইবোসোমাল RNA (Ribosomal RNA বা rRNA) : যে সব RNA রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে রাইবোসোমাল RNA বলে। কোষের সমস্ত RNA-এর শতকরা ৮০-৯০ ভাগই rRNA। কোষের রাইবোসোমে এদের অবস্থান। সর্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং অদ্রবণীয় rRNA প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে রাইবোনিউক্লিয়ো- প্রোটিন কণা গঠন করে।

কাজ : রাইবোসোম নামক কোষ-অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

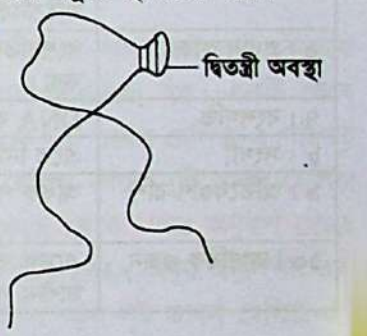

চিত্র ১.৩১ : একটি rRNA।

(iii) বার্তাবহ RNA (Messenger RNA বা mRNA) : যে সব RNA জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসেবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম বাছাই করে, সেগুলোকে মেসেঞ্জার RNA বা বার্তাবহ RNA বলে। DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA সৃষ্টি হয়। mRNA লম্বা চেইনের মতো। mRNA-এর ৫´ প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে **৫´-লিডার** (5´-leader) বলে। আবার ৩´ প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে **৩´-ট্রেইলার** (3´-trailer) বলা হয়। মাঝখানের অংশকে **কোডিং অংশ** (coding region) বলে। পরপর তিনটি বেস মিলে একটি **কোডন** হয়। mRNA নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা বহন করে। কোষের মোট RNA-এর ৫-১০ ভাগ mRNA। এরা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। mRNA অণুর আণবিক ওজন ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ।

কাজ : নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোসোম ও tRNA-র সাহায্যে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে।

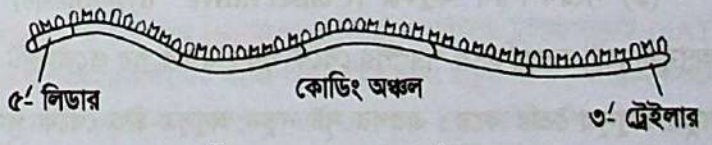

চিত্র ১.৩২: mRNA এর গঠন।

(iv) বংশগতীয় RNA (Genetic RNA বা gRNA) : যে সব RNA কিছু ভাইরাসদেহে বংশগতি বস্তু হিসেবে কাজ করে তাকে বংশগতীয় RNA বলে। এসব ক্ষেত্রে জীবদেহে DNA অনুপস্থিত থাকে। (যেমন-TMV)

কাজ : প্রধান কাজ প্রোটিন তৈরি। কিছু ভাইরাস দেহে বংশগতির উপাদান হিসেবে কাজ করে। (যেমন- TMV)

(v) মাইনর RNA (Minor RNA বা miRNA) : সাইটোপ্লাজমীয় RNA ও নিউক্লীয় RNA নামে কিছু ক্ষুদ্র RNA রয়েছে যারা কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে মিশে এনজাইমের কাঠামো দান করে। এরা মাইনর RNA হিসেবে পরিচিত।

কাজ : বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের কাঠামো দান করা এবং এনজাইম হিসেবে কাজ করা।

RNA-এর কাজ (Functions of RNA) :

১। RNA-এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ। ২। tRNA-অ্যামিনো অ্যাসিড স্থানান্তর করে।

৩। rRNA-রাইবোনিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন করে। ৪। mRNA, DNA হতে বার্তা বহন করে রাইবোসোমে পৌছায়।

DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	DNA	RNA
১। ভৌত গঠন	দ্বিসূত্রক, প্যাঁচানো বা ঘুরানো সিঁড়ির মতো	একসূত্রক, শিকলের ন্যায়
২। রাসায়নিক গঠন	(i) এতে থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার (ii) DNA-এর পাইরিমিডিনে থাইমিন ও সাইটোসিন বেস থাকে।	(i) এতে থাকে রাইবোজ শ্যুগার। (ii) RNA-এর পাইরিমিডিনে ইউরাসিল ও সাইটোসিন বেস থাকে।
৩। প্রকার	DNA-অণুর কোনো প্রকারভেদ নেই। কার্যগত দিক হতে DNA-একই রকম হয়।	কার্যগত দিক হতে RNA পাঁচ প্রকার। যথা- tRNA, rRNA, mRNA, gRNA, মাইনর RNA।
৪। উৎপত্তি	অনুলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।	নতুনভাবে RNA সৃষ্টি হয়। কোনো অনুলিপন হয় না।
৫। অবস্থান	প্রধানত ক্রোমোসোমে থাকে। তবে কখনো মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টেও অবস্থান করে।	ক্রোমোসোম, সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম ও নিউক্লিয়োলাসে থাকে।
৬। প্রধান কাজ	বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা।	প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
৭। বংশগতি	DNA বংশগত চরিত্র বহন করে।	RNA সাধারণত বংশগত চরিত্র বহন করে না।
৮। সংখ্যা	এতে নিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা অনেক বেশি।	এতে নিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা অনেক কম।
৯। অতিবেগুণি রশ্মি	অধিক পরিমাণে অতিবেগুণি রশ্মি শোষণ করে।	তুলনামূলকভাবে কম অতিবেগুণি রশ্মি শোষিত হয়।
১০। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন দশ লক্ষ হতে বহু কোটি ডাল্টন পর্যন্ত হয়।	এদের আণবিক ওজন কয়েক লক্ষের বেশি হয় না।

DNA-এর অনুলিপন (Replication of DNA)

DNA-এর অনুলিপন হয় তা অনেক আগে থেকেই জানা ছিল কিন্তু সঠিক অনুলিপন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা যায় অনেক পরে। প্রাথমিকভাবে DNA অণুর অনুলিপনের জন্য বিজ্ঞানী লেভিয়েস্থাল ও ক্রেন তিনটি অনুকল্প প্রস্তাব করেন (১৯৫৬), এগুলো হলো–

(১) সংরক্ষণশীল অনুকল্প (২) অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প (৩) বিচ্ছুরণশীল অনুকল্প।

নিম্নে প্রক্রিয়াগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

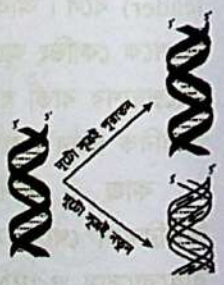

(১) সংরক্ষণশীল অনুকল্প (Conservative hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA-র অণুসূত্র দুটো সম্পূর্ণভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হবার পর প্রত্যেকটি ছাঁচ হিসেবে আলাদাভাবে দুটো নতুন অণুসূত্র তৈরি করে। এরপর সৃষ্ট নতুন অণুসূত্র ছাঁচ থেকে পৃথক হয়ে নতুন DNA অণু সৃষ্টি করে এবং মাতৃ অণুসূত্র দুটো আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয়।

(২) অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প (Semiconservative hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃ DNA অণু থেকে দুটি নতুন DNA অণু সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট DNA অণু দুটোর প্রত্যেকটিতে একটি মাতৃসূত্র অন্যটি নতুন সূত্র। এজন্য একে অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প বা পদ্ধতি বলে।

(৩) বিচ্ছুরণশীল অনুকল্প (Dispersive hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA অণুর সূত্রদ্বয় বিশ্লিষ্ট বা খণ্ডিত হয়ে প্রতিলিপি সৃষ্টি করে। এরপর বিভিন্ন পরিমাণের নতুন ও পুরাতন (মাতৃ) খণ্ডকের সংযুক্তির মাধ্যমে দুটো DNA অণু গঠিত হয়।

১৯৫৭-১৯৫৮ সালে প্রমাণিত হয় যে, DNA অনুলিপিত হয় অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে। স্টেন্ট (১৯৫৭) 'অর্ধ-সংরক্ষণশীল' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। মেসেলসন-স্টাহল (Messelson-Stahl, 1958) পরীক্ষার মাধ্যমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্পটি প্রমাণ করেন। ১৯৬০ সালে সুয়েকা মানব হেলা কোষে এবং সাইমন ১৯৬১ সালে *Chlamydomonas* শৈবালে অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতি প্রমাণ করেন।

অর্ধ-সংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় DNA অণুর অনুলিপন

জীবকোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো তার DNA। বহুকোষী জীবের দেহ গঠনের জন্য জাইগোট কোষকে বারবার বিভাজিত হতে হয়। এককোষী জীবের প্রজনন তথা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও কোষ বিভাজিত হয়। একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হওয়ার আগেই মাতৃকোষের DNA ডাবল হেলিক্সটিকে দুটি ডাবল হেলিক্স-এ পরিণত হতে হয়। কোষ বিভাজন শুরু হওয়ার আগে ইন্টারফেজ পর্যায়ে একটি DNA ডাবল হেলিক্স থেকে দুটি ডাবল হেলিক্স তৈরি হয়। এটিই হলো DNA অণুর অনুলিপন বা রেপ্লিকেশন। যে প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA থেকে তার অনুরূপ DNA উৎপন্ন হয় তাকে DNA অনুলিপন বলে। কোষ চক্রের S ধাপে DNA অনুলিপন সম্পন্ন হয়। DNA অণুর অনুলিপন তথা রেপ্লিকেশন হয়ে থাকে অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে (Semi-conservative method) অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট ডাবল হেলিক্স-এর একটি হেলিক্স থাকবে পুরাতন এবং একটি হেলিক্স হবে নতুনভাবে সৃষ্ট। Mathew Messelson ও Franklin Stahl ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আদি কোষের DNA বৃত্তাকার, এতে কোনো প্রান্ত বা মাঝ নেই, তাই যে কোনো এক জায়গায় অনুলিপন শুরু হয় এবং রেপ্লিকেশন ফর্ক দুই দিকে সরে গিয়ে মাঝামাঝি স্থানে মিলিত হয়ে দ্রুত অনুলিপন শেষ হয়। ব্যাকটেরিয়ার বৃত্তাকার DNA অনুলিপনে প্রতি মিনিটে দশ লক্ষ পর্যন্ত বেসপেয়ার যুক্ত হতে পারে। প্রকৃত কোষের DNA লম্বা সূত্রাকার। এর দুটি প্রান্ত থাকে। তাছাড়া প্রকৃত কোষের DNA-এর অনুলিপন গতি কম, মিনিটে ৫০০-৫০০০ পর্যন্ত বেসপেয়ার যুক্ত হতে পারে। এ কারণে প্রকৃত কোষের লম্বা সূত্রাকার DNA-এর কোনো প্রান্তেই অনুলিপন শুরু হয় না, অনুলিপন শুরু হয় সূত্রের মাঝে একই সাথে বহু জায়গায় (ড্রসোফিলাতে ৫০০০০ স্থানে)।

DNA রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) একটি ছাঁচ (ii) অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট (dATP, dGTP, dTTP এবং dCTP; d = deoxyribose), (iii) নিউক্লিয়োটাইডের মধ্যে বন্ড সৃষ্টির জন্য প্রচুর শক্তি, যা ট্রাইফসফেট থেকে আসে; (iv) গুরুত্বপূর্ণ কিছু এনজাইম ও সহযোগী প্রোটিন যাদেরকে একত্রে বলা হয় রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স বা রেপ্লিসোম (Replication complex or replisome). রেপ্লিসোমের প্রধান এনজাইম হলো DNA পলিমারেজ। এ ছাড়াও আছে হেলিকেজ, প্রাইমেজ, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP), গাইরেজ, এপিআইসোমারেজ ইত্যাদি।

DNA অনুলিপনের ধাপসমূহ : প্রকৃত কোষ DNA অনুলিপন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অর্ধ-সংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় DNA অনুলিপনের ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

১। DNA ডাবল হেলিক্স-এর এক বা একাধিক বিন্দুতে অনুলিপন কাজের সূচনা ঘটে যাকে বলা হয় Origin of replication অর্থাৎ 'Ori' (অরি) বা অনুলিপন সূচনা বিন্দু।

২। সূচনা বিন্দু থেকে ডাবল হেলিক্স-এর পাক খুলতে শুরু করে এবং একই সাথে A=T, G ≡ C নিউক্লিয়োটাইডের মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে উক্ত স্থানে ডাবল হেলিক্স দুটি একক হেলিক্স-এ পরিণত হয়।

হেলিকেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরূপ ঘটে থাকে। হেলিকেজ এনজাইম ATP থেকে শক্তি নিয়ে হাইড্রোজেন বন্ড বিচ্ছিন্নকরণ কাজ করে থাকে।

গাইরেজ (gyrase) এনজাইম সম্মুখের DNA স্ট্র্যান্ড-এর প্যাঁচকে (twist) একত্র হতে দেয় না। তবে অনুলিপনকৃত পেছনের অংশের প্যাঁচ তৈরিতে সহায়তা করে। প্রকৃত কোষে এ কাজটি করে এপিআইসোমারেজ এনজাইম।

৩। পৃথক হওয়া প্রতিটি একক হেলিক্স নতুন সম্পূরক হেলিক্স তৈরির ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪। প্রতিটি সূচনা বিন্দুতে দুটি করে রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স থাকে। ডাবল হেলিক্স-এর জোড়া ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স দুটি, একটি অপরটির বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে। রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স-এ বিদ্যমান Single Strand Binding Protein (SSBP) পৃথক হওয়া সূত্র দুটিকে পুনরায় সংযুক্ত হতে দেয় না। ডাবল হেলিক্স-এর নিউক্লিয়োটাইড জোড় ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়ার ফলে সেখানে Y-আকৃতির একটি রেপ্লিকেশন ফর্ক (fork) তৈরি হয়।

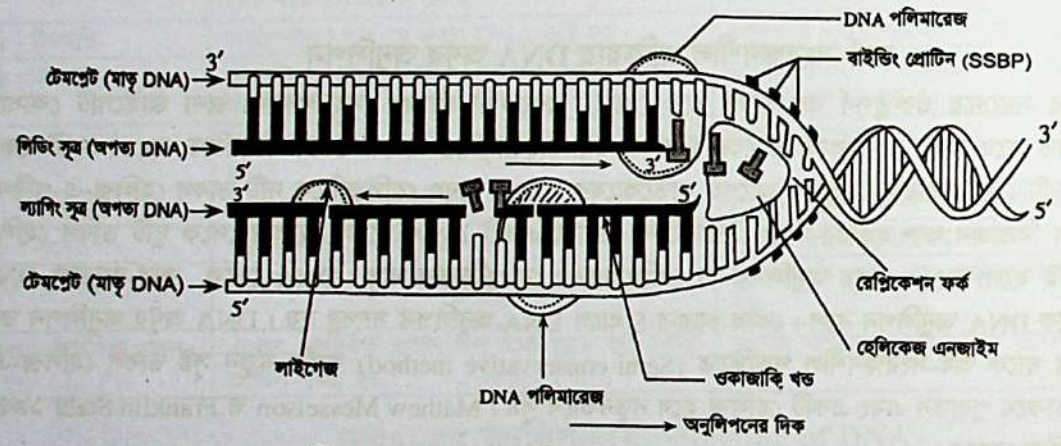

চিত্র ১.৩৩ : DNA অনুলিপন প্রক্রিয়া।

৫। প্রাইমেজ (Primase) এনজাইম পৃথককৃত একটি সূত্রকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে তার একটি অংশ কপি করে একটি প্রাইমার তৈরি করে দেয়। প্রাইমার হলো RNA-এর কয়েকটি ক্ষারকের সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্স। প্রাইমারে মুক্ত ৩′-OH গ্রুপ থাকে। DNA পলিমারেজ এনজাইম-III একটি নিউক্লিয়োসাইড ট্রাইফসফেট এনে মুক্ত ৩′-OH গ্রুপে সংযুক্ত করে অনুলিপন কাজের সূচনা করে। এ সময় ট্রাইফসফেটের একটি ফসফেট নিউক্লিয়োসাইডের সাথে সংযুক্ত থেকে যায় (তাই নিউক্লিয়োটাইড) এবং অপর দুটি পাইরোফসফেট হিসেবে মুক্ত হয়ে যায়। এ সময় অনেক শক্তি নির্গত হয়। পরে পাইরোফসফেট ভেঙ্গে দুটি ফসফেট আয়ন-এ পরিণত হয়। এ সময়ও শক্তি নির্গত হয়। DNA পলিমারেজ-III কেবলমাত্র ৩′-OH প্রান্তে নতুন নিউক্লিয়োটাইড যোগ করতে পারে। এ কারণেই নতুন সৃষ্ট DNA হেলিক্স সবসময়ই ৫′-প্রান্ত থেকে ৩′-প্রান্তের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুলিপন শুরু হওয়ার পর এক সময় DNA পলিমারেজ এনজাইম প্রাইমারকে সরিয়ে দেয়, কারণ DNA স্ট্র্যান্ড-এ RNA থাকতে পারে না।

[এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়োসাইড ট্রাইফসফেটের শেষ দুটি ফসফেট পাইরোফসফেট হিসেবে স্থান ত্যাগ করে, সংযুক্ত অপর ফসফেট ডিঅক্সিরাইবোজের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। প্রথম নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপ দ্বিতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে ডায়েস্টার-ফসফেট-ডায়েস্টার বন্ধন তৈরি করে। দ্বিতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপের সাথে তৃতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেট সংযুক্ত হয়। এভাবে অনুলিপন চলতে থাকে। মনে রাখতে হবে আগত নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেট পূর্বের নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। কোন নিউক্লিয়োটাইডের পর কোন নিউক্লিয়োটাইড এসে যুক্ত হবে তা ছাঁচ হেলিক্স-এর তথ্যের উপর নির্ভর করবে। তবে অবশ্যই AT, GC বাঁধাই বজায় থাকবে।]

৬। পৃথককৃত দুটি সূত্রের একটি তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে যা নিরবচ্ছিন্নভাবে ফর্ক-এর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন সৃষ্ট এই সূত্রকে বলা হয় **অগ্রগামী সূত্র বা লিডিং সূত্র** (leading strand)। অপর সূত্রটি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুলিপন সৃষ্টি করতে পারে না। খণ্ড খণ্ডভাবে সৃষ্ট নতুন সূত্রকে বলা হয় **ধীরগামী সূত্র বা ল্যাগিং সূত্র** (lagging strand)। (তীর চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিরূপ সৃষ্টির অগ্রসরমান দিক দেখানো হয়েছে।)

৭। লিডিং সূত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অগ্রসর হওয়ার কারণে ল্যাগিং সূত্রে জোড়াবিহীন নিউক্লিয়োটাইডের সারি তৈরি হয়। জোড়াবিহীন নিউক্লিয়োটাইডের সারিটি একটু লম্বা হলে **প্রাইমেজ এনজাইম** কার্যকরী হয় এবং একটি **প্রাইমার** তৈরি করে অর্থাৎ মুক্ত ৩-OH ভাস্ব সৃষ্টি করে দেয় ফলে অনুলিপন কাজ শুরু হয়। লিডিং সূত্রের মতো এখানে অনুলিপন নিরবচ্ছিন্ন হয় না– খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। প্রতিটি খণ্ডের জন্য একটি প্রাইমার ব্যবহৃত হয়। DNA পলিমারেজ-1, প্রাইমারকে DNA দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়, ফলে এখানে একটি ছোট গ্যাপ থেকে যায়।

৮। DNA অণুর অনুলিপনে ল্যাগিং সূত্রের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশকে **Okazaki** খণ্ড বলে (আবিষ্কারকের নামানুসারে)। লাইগেজ এনজাইম Okazaki খণ্ডগুলোর মধ্যকার গ্যাপকে সংযুক্ত করে অনুলিপিত অংশকে নিরবচ্ছিন্নতা দান করে।

৯। একই সাথে DNA ডাবল হেলিক্স-এর বিভিন্ন স্থানে অনুলিপন কার্য শুরু হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপূর্ণ ডাবল হেলিক্সটিই অনুলিপিত হয়ে দুটি ডাবল হেলিক্স-এ পরিণত হয় অর্থাৎ অনুলিপন সমাপ্ত হয়। অনুলিপন সমাপ্ত হলে রেপ্লিসোম (এনজাইম কমপ্লেক্স) বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায়।

১০। **DNA প্রুফ রিডিং ও মেরামত :** নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরিকালে ভুল নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। DNA অনুলিপনের সময় মানুষের প্রতি ১০০০ জিন এর মধ্যে একটি ভুল হতে পারে। যেমন A = T এর স্থলে A = C হয়ে যেতে পারে। DNA-এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ভুল ধরার জন্য প্রুফ রিডিং ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ভুলকে বলা হয় **মিসম্যাচ (Mismatch)**। ভুল ধরা পড়লে তা মেরামত করে নেয়ারও ব্যবস্থা আছে। যেমন A এর সাথে C যুক্ত হয়ে থাকলে, মেরামতের মাধ্যমে C-কে সরিয়ে দিয়ে T অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়।

এছাড়া পরিবেশীয় বিভিন্ন উপাদানের কারণে (UV রশ্মি, বিষাক্ত মৌল, কারসিনোজেনিক পদার্থ ইত্যাদি) DNA-এর ক্ষত (damage) হতে পারে। এটিও মেরামতের ব্যবস্থা আছে। Mismatch-এর কারণে মানুষের এক ধরনের কোলন ক্যান্সার হয়ে থাকে। মানুষের Xeroderma Pigmentosum নামক এক প্রকার চর্মরোগ হয়ে থাকে। সাধারণত UV রশ্মি দ্বারা DNA এর যে ক্ষত হয় তা মেরামতের ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিতে না থাকলে রৌদ্রতাপে তার স্কিন ক্যান্সার হতে পারে।

রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স (Replication complex) : DNA অনুলিপনের সময় সৃষ্ট রেপ্লিকেশন ফর্কের নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিছু এনজাইম ও প্রোটিন সমন্বিত হয়ে একটি জটিল আণবিক যান্ত্রিক গঠন সৃষ্টি করে, একে বলা হয় **রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স** বা **রেপ্লিসোম**। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো–

উপাদান	DNA অনুলিপনে কাজ
i. টপোআইসোমারেজ	DNA অণুকে অতিমাত্রায় প্যাঁচানো অবস্থা থেকে মুক্ত করে থাকে।
ii. DNA হেলিকেজ	রেপ্লিকেশন ফর্কে DNA ডাবল হেলিক্স প্যাঁচগুলো খুলে দেয়।
iii. DNA পলিমারেজ	নিউক্লিয়োটাইড অণু যুক্ত করে 5′ প্রান্ত - 3′ প্রান্ত নির্দেশিত পরিপূরক স্ট্র্যান্ড বা শিকল গঠন করে থাকে। DNA প্রুফ রিডিং করে।
iv. সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP)	DNA অণুর একক স্ট্র্যান্ডে সংযুক্ত হয় যাতে এরা পুনরায় দ্বি-তন্ত্রী অবস্থায় ফিরে না আসে।
v. লাইগেজ	ওকাজাকি খণ্ডকে পরিপূরক স্ট্র্যান্ডে যুক্ত করে।
vi. প্রাইমেজ	RNA প্রাইমারকে স্ট্র্যান্ডের প্রান্তে যুক্ত করে।

জীবজগতে DNA প্রতিলিপনের গুরুত্ব অপরিসীম। কোষ বিভাজন এবং গ্যামিট সৃষ্টির জন্য DNA অনুলিপন অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ দেহের বৃদ্ধি ও জনন এবং এর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে স্থানান্তর ইত্যাদির জন্য

DNA অনুলিপন বাধ্যতামূলক। DNA-এর গঠন স্থায়ী, যা অনুলিপনের মাধ্যমেও পরিবর্তন ঘটে না। DNA হতে সকল প্রকার RNA উৎপন্ন হয়। মিউটেশন ছাড়া DNA-তে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) বা প্রতিলিপন

ইতোমধ্যেই আমরা DNA এবং RNA-এর গঠন ও কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। এখন DNA অণুতে গ্রথিত (encoded) রাসায়নিক সংকেত বা তথ্যগুলো কীভাবে DNA থেকে RNA-তে এবং RNA থেকে প্রোটিন-এ প্রবাহিত হয় এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবো। **DNA অণুতে গ্রথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA(mRNA) অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন।** (HIV-এর ক্ষেত্রে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ঘটে।) RNA তৈরির এ প্রক্রিয়াটি DNA কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সহজভাবে বলা যায়, **DNA থেকে RNA উৎপাদন প্রক্রিয়ার নাম হলো ট্রান্সক্রিপশন। RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন।** ট্রান্সক্রিপশন নিউক্লিয়াসে সংঘটিত হয় এবং এতে সৃষ্ট mRNA নিউক্লিয়ার ছিদ্রের মাধ্যমে সাইট্রোপ্লাজমে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াটির একটি সরল রূপরেখা নিম্নে দেয়া হলো :

5′------ ACTGCCATTCCCGGCATAACG ----- 3′
3′------ TGACGGTAAGGGCCGTATTGC ----- 5′ } DNA

↓ RNA পলিমারেজ II

5′------ ACUGCCAUUCCCGGCAUAACG ---------- 3′ mRNA

DNA অণুর 5′→ 3′ স্ট্র্যান্ডটির নাম সেন্স বা কোডিং স্ট্র্যান্ড, আর 3′ → 5′ স্ট্র্যান্ডকে বলে এন্টি-সেন্স বা এন্টি কোডিং স্ট্র্যান্ড। RNA এ পলিমারেজ II ডাবল স্ট্র্যান্ডযুক্ত DNA কে টেমপ্লেট বা ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে সংশ্লেষণ করে এক স্ট্র্যান্ডযুক্ত mRNA অণু। এটি DNA অণুর হুবহু কপি হলেও T এর স্থলে U থাকে। DNA থেকে mRNA সংশ্লেষণের সময় এভাবে বংশগতি সংবাদ এর বিশ্বস্ততা বজায় থাকে।

ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় ক্যাপ সাইট থেকে। প্রাক RNA এর 5 প্রান্তে 9 মিথাইল গুয়ানোসাইন যুক্ত হয়ে একে ব্লক করে দেয়। এরই নাম ক্যাপিং বা টুপি পরানো। তারপরে ট্রান্সলেট হয় না এমন অল্প একটু জায়গা থাকে। এর নাম লিডার সিকোয়েন্স। তারপর অবস্থিত প্রারম্ভ নিয়ন্ত্রক কোডন, AUG। এটি ট্রান্সলেশন শুরুর সংকেত দেয়। স্টপ কোডন দেয় ট্রান্সলেশন বন্ধের সংকেত।

ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার জন্য যা প্রয়োজন

(i) DNA ছাঁচ (template)
(ii) RNA-পলিমারেজ এনজাইম যা একাধিক রকম হতে পারে।
(iii) মুক্ত রাইবোনিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট (ATP, GTP, CTP এবং UTP).
(iv) রাসায়নিক শক্তি, ট্রাইফসফেট ভেঙ্গে নিউক্লিয়োটাইড এবং পাইরোফসফেট সৃষ্টিকালে মুক্ত হয়। পাইরোফসফেট ভেঙ্গে দুই আয়ন ফসফেট তৈরি কালেও কিছু অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যায়।
(v) কিছু সহযোগী প্রোটিন।

প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- (i) সূচনা (initiation), (ii) সূত্র বর্ধিতকরণ (elongation) এবং (iii) সমাপ্তিকরণ (termination)। প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিশন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) ট্রান্সক্রিপশন সূচনা (initiation) : DNA-তে প্রতিটি জিনের জন্য একটি প্রোমোটার (promoter) থাকে (প্রোমোটার হলো জিনের রেগুলেটরি অংশের বিশেষ সিকোয়েন্স বিশিষ্ট একটি অংশ।)। প্রথমে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর নামক

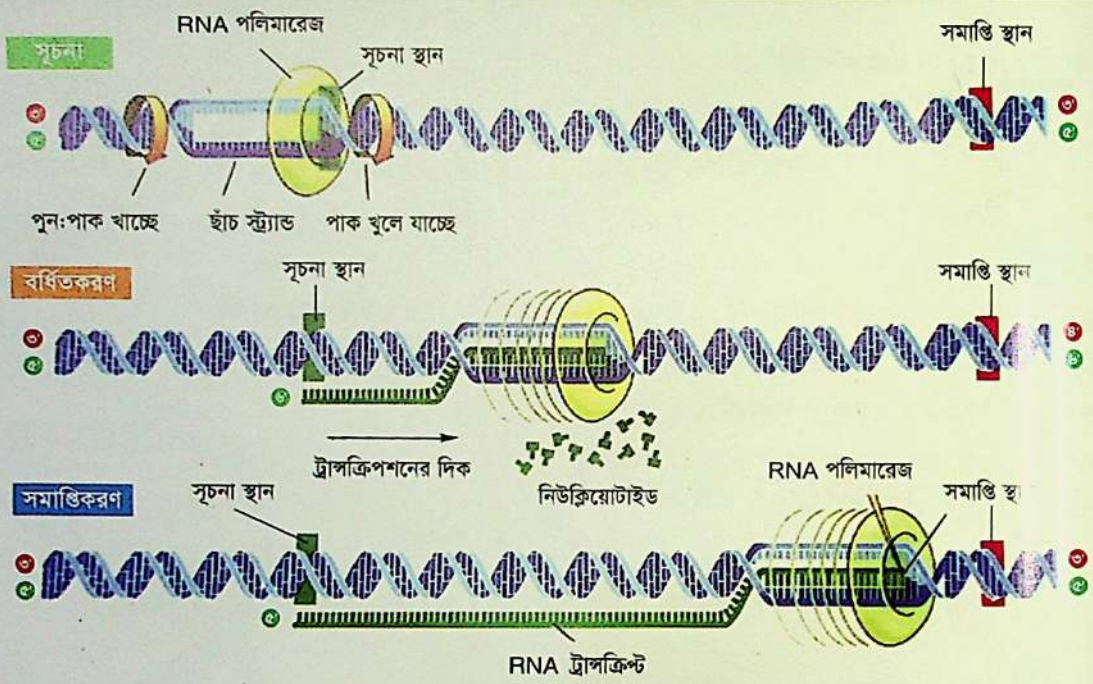

চিত্র : ট্রান্সক্রিপশন

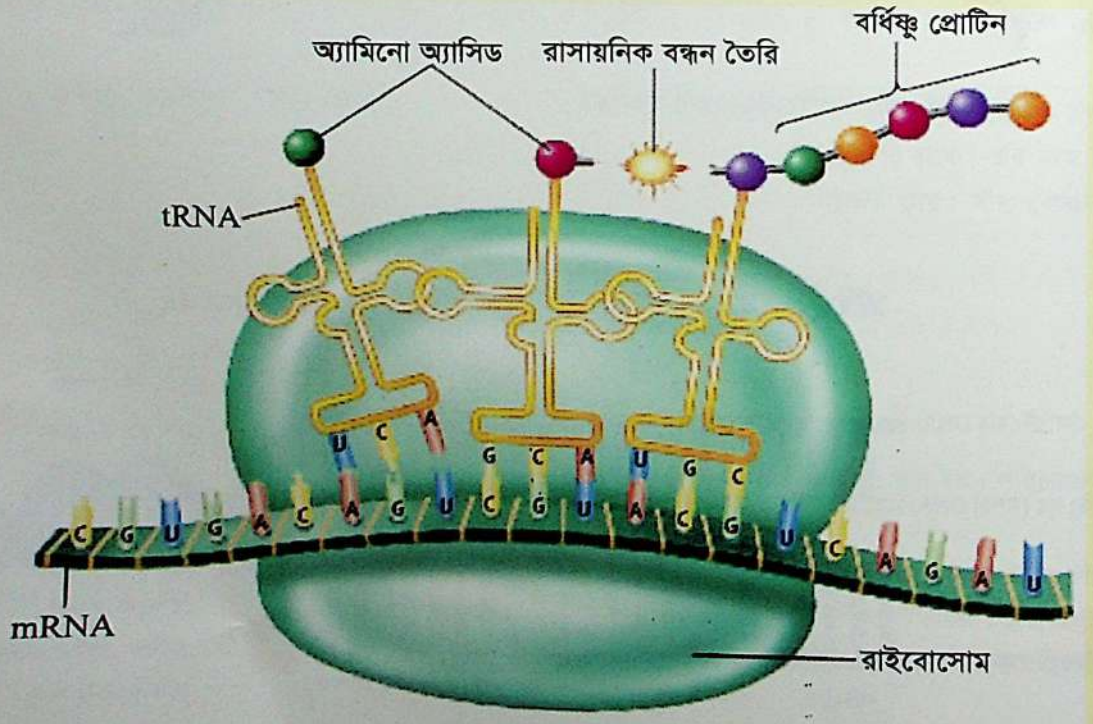

চিত্র : ট্রান্সলেশন

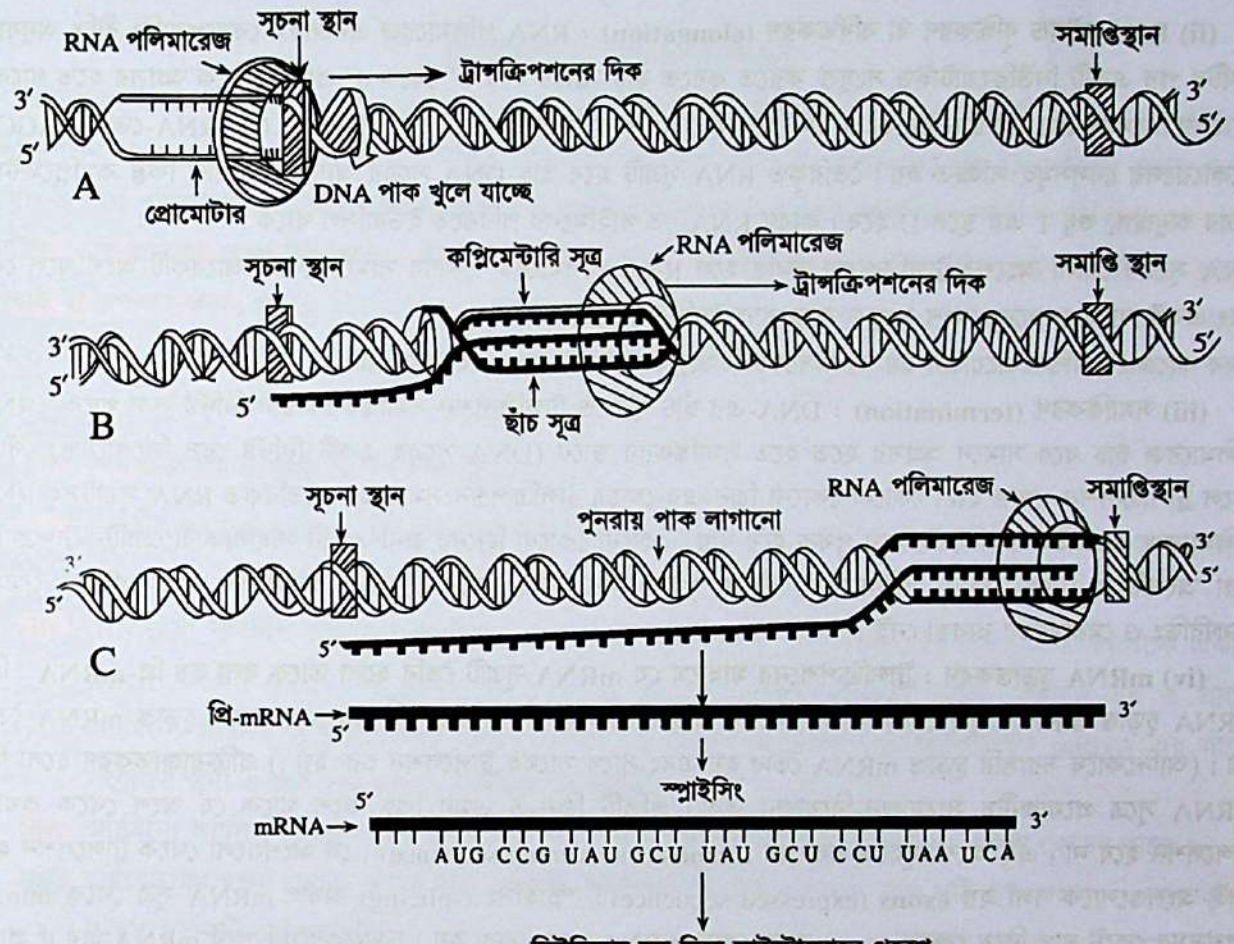

নিউক্লিয়ার রন্ধ্র দিয়ে সাইটোসোলে প্রবেশ

A - ট্রান্সক্রিপশন সূচনা; B - mRNA সূত্র বর্ধিতকরণ; C - ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্তিকরণ

চিত্র : ১.৩৪ : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া।

একদল প্রোটিন প্রোমোটারে আবদ্ধ হয়। এরপর RNA-পলিমারেজ এনজাইম ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ও প্রোমোটারে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। (আদি কোষে, যেমন ব্যাকটেরিয়াতে RNA-পলিমারেজ সরাসরি প্রোমোটারে সংযুক্ত হয়)। প্রোমোটার RNA-পলিমারেজ এনজাইমকে নির্দেশ দান করে কোথা থেকে ট্রান্সক্রিপশন শুরু করতে হবে এবং DNA ডাবল হেলিক্স-এর কোন স্ট্র্যান্ড-এ ট্রান্সক্রিপশন হবে। প্রোমোটারে সংযুক্ত হবার পর RNA পলিমারেজ প্রথমে DNA-এর পাক খুলে নেয়।

- সাধারণত প্রথমে কমপক্ষে ২০টি বেসপেয়ারের পাক খুলে যায়।
- DNA ডাবল হেলিক্স-এর যে স্ট্রান্ডে কাঙ্ক্ষিত জিন অবস্থিত সেই স্ট্র্যান্ডকে ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহার করে ট্রান্সক্রাইব করা শুরু করে। অপর স্ট্র্যান্ডটিকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড, যা ট্রান্সক্রাইব করা হয় না।
- ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় ৫′-৩′ মুখী অবস্থায়। RNA পলিমারেজ-II (প্রকৃত কোষে তিন ধরনের RNA পলিমারেজ থাকে। কিন্তু আদিকোষে এক ধরনের পলিমারেজ থাকে) ATP, GTP, CTP এবং UTP থেকে বেসপেয়ারিং নীতি অনুযায়ী ছাঁচে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের পরিপূরকটি বেছে নিয়ে ছাঁচের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে RNA তৈরি সূচনা করে। ছাঁচে সূচনা স্থান ও সমাপ্তি স্থান পূর্ব নির্ধারিত থাকে।

(ii) RNA স্ট্র্যান্ড বৃদ্ধিকরণ বা বর্ধিতকরণ (elongation) : RNA পলিমারেজ এনজাইম বেসপেয়ারিং রীতি অনুযায়ী একটির পর একটি নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করতে করতে ছাঁচ স্ট্র্যান্ড ধরে ৩′ থেকে ৫′ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ছাঁচ স্ট্যান্ড-এ যদি ATTCGA সিকোয়েন্সে বেস সজ্জিত থাকে, তা হলে RNA-তে UAAGCU সিকোয়েন্সের বেসসমূহ সজ্জিত হয়। তৈরিকৃত RNA সূত্রটি হবে ছাঁচ DNA সূত্রের অ্যান্টিপ্যারালাল কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি সূত্রের অনুরূপ, শুধু T এর স্থলে U হবে। কারণ RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে।

DNA সূত্রের খোলা অংশের ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হলে RNA পলিমারেজ পুনরায় সামনে থেকে আরেকটি অংশ খুলে নেয় এবং একই সাথে পেছনের অংশ সংযুক্ত করে পাক তৈরি করে দেয়।

এসব কাজে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা ফসফেট বিচ্ছিন্নকরণ থেকে সরবরাহ করা হয়।

(iii) সমাপ্তিকরণ (termination) : DNA-এর ছাঁচ স্ট্র্যান্ডে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্তিকরণ স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। RNA পলিমারেজ ছাঁচ ধরে সামনে অগ্রসর হতে হতে সমাপ্তিকরণ স্থানে (DNA সূত্রের একটি নির্দিষ্ট বেস সিকোয়েন্স) পৌঁছে গেলে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হয়। কোনো কোনো জিন-এর ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হলে তৈরিকৃত RNA সূত্রটিসহ RNA পলিমারেজ এনজাইম এমনিতেই সরে পৃথক হয়ে যায়। কোনো কোনো জিনের জন্য একটি সাহায্যকারী প্রোটিন ট্রান্সক্রাইব করা অংশটিকে (এবং RNA পলিমারেজ) টেনে পৃথক করে নিয়ে আসে। DNA অনুলিপির মতো এখানে কোনো প্রুফরিডিং ও মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

(iv) mRNA চূড়ান্তকরণ : ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে যে mRNA সূত্রটি তৈরি হলো তাকে বলা হয় প্রি-mRNA। প্রি-mRNA চূড়ান্ত mRNA সূত্র থেকে দীর্ঘ। বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রি-mRNA থেকে চূড়ান্ত mRNA তৈরি হয়। (আদিকোষে সরাসরি চূড়ান্ত mRNA তৈরি হয় এবং সাথে সাথেই ট্রান্সলেশন শুরু হয়।) প্রক্রিয়াজাতকরণ হলো প্রি-mRNA সূত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করা। প্রতিটি জিন-এ এমন কিছু অংশ থাকে যে অংশ থেকে কখনো ট্রান্সলেশন হবে না। এই অংশসমূহকে বলা হয় **introns** (intervening sequence)। যে অংশগুলো থেকে ট্রান্সলেশন হবে সেই অংশগুলোকে বলা হয় **exons** (expressed sequence)। স্প্লাইসিং (splicing) অর্থাৎ mRNA সূত্র থেকে introns অংশসমূহ কেটে বাদ দিয়ে কেবল exons অংশ রেখে mRNA চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তকরণের পূর্বে mRNA-এর ৫′ প্রান্তে গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড বিশিষ্ট 'ক্যাপ' যুক্ত করা হয় এবং ৩′ প্রান্তে পলি A (৫০-২৫০টি এডিনিন) লেজযুক্ত করা হয়। ক্যাপ ও লেজ সংযুক্তির কারণে চূড়ান্তকৃত mRNA অণুটি নিউক্লিয়াস থেকে ছিদ্র পথ দিয়ে দ্রুত সাইটোপ্লাজমে যেতে পারে, হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের ক্ষতিকারক ভূমিকা থেকে মুক্ত থাকে এবং সহজে রাইবোসোমে সংযুক্ত হতে পারে।

mRNA ট্রান্সক্রিপশন ও প্রসেসিং হয় নিউক্লিয়াসে, আর ট্রান্সলেশন হয় সাইটোপ্লাজমে। ট্রান্সক্রিপশনের সময় সকল ইনট্রোনকে এনজাইমের সাহায্যে কেটে অপসারণ করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী এক্সনগুলোকে পুনরায় জোড়া দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। এ ঘটনাকে জিন স্প্লাইসিং বলা হয়। mRNA স্প্লাইসিং করতে স্প্লাইসিয়োসোম (spliceosome) লাগে। কতগুলো প্রোটিন ও snRNA (= small nuclear RNA) মিলিতভাবে স্প্লাইসিয়োসোম গঠন করে।

ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন থেকে একটি ১০০০ নিউক্লিয়োটাইড বিশিষ্ট mRNA ট্রান্সক্রিপ্ট করতে মাত্র সময় লাগে এক সেকেন্ড। জিনোমের (DNA-এর) যতটুকু অংশ নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি RNA অণু ট্রান্সক্রাইব করে তাকে ট্রান্সক্রিপশন একক বলা হয়। একটি ট্রান্সক্রিপশন এককে প্রোমোটার, শুরুর বিন্দু এবং শেষ বিন্দু-এই তিনটি অংশ আছে। আদিকোষ এবং প্রকৃতকোষের ট্রান্সক্রিপশনে কিছুটা পার্থক্য আছে। DNA- অণুর যে অংশ বিশেষ একটি পলিপেপটাইড চেইন এর সকল তথ্য সংরক্ষণ করে তাকে জিন বা সিস্ট্রন (cistron) বলে।

প্রকৃত কোষে এক জিন হতে একটি mRNA ট্রান্সক্রাইব হয় এবং তা থেকে একটি প্রোটিন ট্রান্সলেট হয়। একে বলা হয় Monocistronic ট্রান্সক্রিপ্ট। আদি কোষে একটি রিসেপি (recipe) ট্রান্সক্রাইব করে তা থেকে একাধিক প্রোটিন ট্রান্সলেট হতে পারে। একে বলা হয় **Polycistronic** ট্রান্সক্রিপ্ট।

ট্রান্সলেশন (Translation)

জীবদেহে জিন-এর প্রকাশের জন্য প্রয়োজন DNA-এর জিন অংশ থেকে RNA (mRNA) সৃষ্টি করা, যাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন, এবং mRNA থেকে পলিপেপটাইড চেইন তথা প্রোটিন সৃষ্টি করা, যাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন। অর্থাৎ RNA নির্দেশিত পথে পলিপেপটাইড চেইন তথা প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সলেশন। সহজ কথায় mRNA থেকে প্রোটিন তৈরি প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশন হলো DNA-এর ভাষাকে mRNA-এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করা। DNA থেকে তথ্য বা নির্দেশ 'কপি' করে থাকে mRNA (transcription)। DNA এর ভাষাকে RNA এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় রূপান্তরিত করাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন (translation)। ট্রান্সলেশন রাইবোসোমে সংঘটিত হয়। শৃঙ্খলিত পলিপেপটাইডই হলো প্রোটিন।

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ :

(i) mRNA যা DNA থেকে জেনেটিক কোড বহন করে নিয়ে আসে। এটি প্রোটিন সংশ্লেষণের ছাঁচরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ii) tRNA যা সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে আনে। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য কমপক্ষে একটি tRNA থাকে। tRNA অণু খুবই ছোট। এতে ৭৫-৮০টি নিউক্লিয়োটাইড থাকে। tRNA-এর ৩′ প্রান্তে অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তির জন্য কোডন থাকে এবং মাঝামাঝি অবস্থায় বিপরীত দিকে mRNA-এর সাথে সংযুক্তির জন্য ৩ বেস-এর একটি অ্যান্টিকোডন থাকে।

(iii) অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত বিশ প্রকার। বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য ৬১ প্রকার কোডন থাকে।

(iv) রাইবোসোম হলো tRNA বসার মঞ্চ। প্রতিটি রাইবোসোমে tRNA বসার জন্য দুটি স্থান থাকে, A-স্থান এবং P-স্থান। একটি রাইবোসোম যে কোনো mRNA-র সাথে এবং সকল tRNA-র সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

(v) **অ্যাকটিভেটিং এনজাইম :** এদেরকে সাধারণত অ্যামিনো-অ্যাসিল tRNA সিন্থেটেজেজ (Aminoacyl-tRNA Synthetases) বলে। প্রতিটি অ্যাকটিভেটিং এনজাইম একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ও একটি tRNA-এর জন্য নির্দিষ্ট। অ্যামিনো অ্যাসিল tRNA সিন্থেটেজেজ এনজাইমে তিনটি কার্যকরী সাইট থাকে; (i) একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য, (ii) একটি ATP-এর জন্য এবং (iii) একটি নির্দিষ্ট tRNA-এর জন্য। এনজাইম প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিড (AA) ও ATP এর সাথে ক্রিয়া করে AA-AMP bond তৈরি করে এবং পাইরুফসফেট বের হয়ে যায়। এরপর এটি tRNA এর সাথে যুক্ত হয়। দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পেপটাইড বন্ড সৃষ্টির শক্তি এ পর্যায় থেকেই আসে। এনজাইমে tRNA-এর সাথে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তির পর AMP বের হয়ে যায় এবং পরে এনজাইম মুক্ত হয়।

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া

১. নির্দিষ্ট প্রথম অ্যামিনো-অ্যাসিডসহ শক্তিকৃত (charged) tRNA এবং রাইবোসোমের ক্ষুদ্র একক mRNA সূত্রের সূচনা বিন্দুতে সংযুক্ত হয়। রাইবোসোমের ক্ষুদ্র এককটি mRNA সূত্রের স্বীকৃত সিকোয়েন্স-এ সংযুক্ত হয়। সাধারণত শুরু করার কোড হলো AUG, কাজেই প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড হলো মেথিওনিন। মেথিওনিন যুক্ত tRNA-এর অ্যান্টিকোডন mRNA সূত্রের সম্পূরক বেসপেয়ারিং-এর সূচনা কোডন UAC-এর সাথে আবদ্ধ হয়। এর সবগুলোকে মিলিতভাবে সূচনা-যৌগ (initiation complex) বলে।

২. এরপর রাইবোসোমের বড় এককটি এসে এই যৌগের সাথে যুক্ত হয়। বড় এককে দুটি সাইট থাকে। প্রথমটি A-সাইট ও পরেরটি P-সাইট। সাইট দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত। tRNA প্রথমে A সাইট-এ যুক্ত হয় এবং পরে A-সাইট খালি করে P-সাইট এ চলে যায়। P-সাইট-এ অ্যামিনো অ্যাসিড পলিপেপটাইড চেইনে সংযুক্ত হয়। খালি A-সাইট এ পুনরায় অপর একটি অ্যামিনো-অ্যাসিডসহ নতুন tRNA যুক্ত হয়।

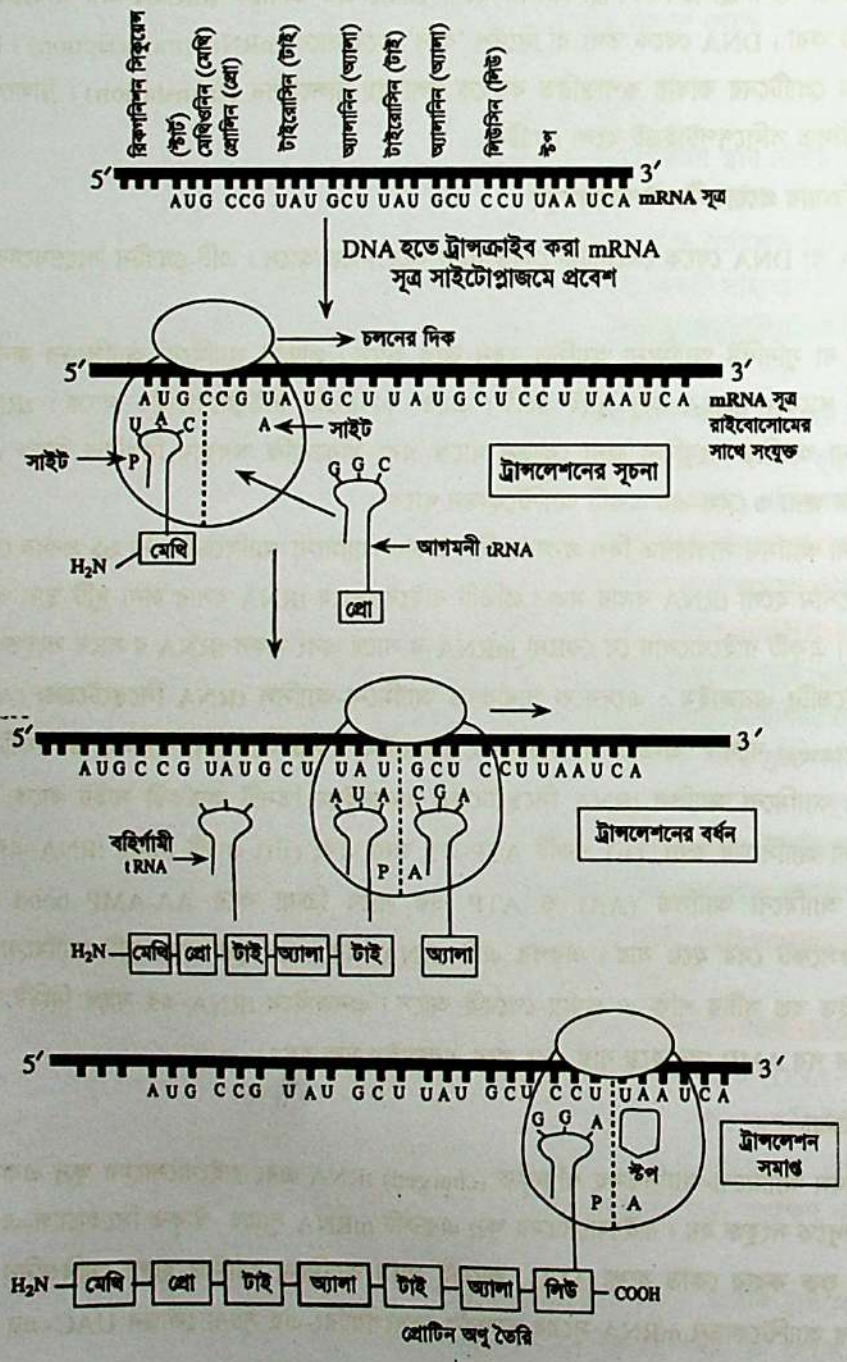

চিত্র ১.৩৫ : ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া।

৩. GTP থেকে শক্তি গ্রহণ করে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর (initiation factor) নামক এক দল প্রোটিন mRNA, tRNA, রাইবোসোম ইত্যাদিকে এক সাথে এনে দেয়।

৪. সংযুক্ত স্থানে mRNA এবং tRNA সূত্রদ্বয় অ্যান্টিপ্যারালাল এবং বেস-পেয়ারিং কমপ্লিমেন্টারি বা সম্পূরক।

৫. অ্যামিনো অ্যাসিডকে সংযুক্ত করে tRNA সূচনা যৌগ থেকে সরে গিয়ে সাইটোসোল-এ (Cytosol = সাইটোপ্লাজমের তরল অংশ) চলে আসে এবং পুনরায় একই জাতীয় অপর অ্যামিনো অ্যাসিড আনার জন্য প্রস্তুত হয়।

৬. রাইবোসোম mRNA সূত্রের ৫–৩ মুখী অবস্থায় চলতে থাকে, ফলে একটির পর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন অণু গঠন করে।

প্রক্রিয়াটি চলতে থাকলে—

(i) পরবর্তী শক্তিকৃত tRNA খালি A-সাইট-এ প্রবেশ করে।

(ii) tRNA এর অ্যামিনো অ্যাসিড P-সাইট-এ এসে বর্ধিষ্ণু পলিপেপটাইড চেইনের সাথে যুক্ত হয় এবং

(iii) সম্পূর্ণ tRNA পলিপেপটাইড যৌগ, এর কোডনসহ নতুন করে শূন্য হওয়া P-সাইট-এ চলে আসে। Elongation factors বলে এক দল প্রোটিন এসব কাজে সহায়তা করে।

৭. রাইবোসোম mRNA বরাবর চলতে চলতে যখন স্টপ কোডন (UAA, UAG বা UGA)-এ প্রবেশ করে অর্থাৎ রাইবোসোমের A-সাইটে স্টপ কোডন প্রবেশ করে তখন ট্রান্সলেশন বন্ধ হয়ে যায়। এসব কোডন কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড বা কোনো tRNA এনকোড করে না, বরং এর পরিবর্তে একটি Protein release factor-এর সাথে সংযুক্ত হয়।

৮. নতুন সৃষ্ট প্রোটিন অণুটি তখন রাইবোসোম হতে মুক্ত হয়ে যায়।

৯. ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পলিসোম (পলিরাইবোসোম) ট্রান্সলেশনের গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়্যাল ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া (প্রোটিন সংশ্লেষণ) ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কতিপয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং মানবদেহকে রোগ থেকে মুক্তি দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক	বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পর্যায়
ক্লোরোমাইসিন	পেপটাইড বন্ধনী সৃষ্টিতে
ইরিথ্রোমাইসিন	রাইবোসোমে mRNA-এর চলনে
নিওমাইসিন	mRNA ও tRNA-এর মধ্যে আন্তঃবিক্রিয়াতে
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	ট্রান্সলেশনের সূচনা লগ্নে
টেট্রাসাইক্লিন	রাইবোসোমের tRNA-এর সংযুক্তি পর্যায়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে mRNA দ্বারা সরাসরি নির্ধারিত হয় প্রোটিন অণুর অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম। আর mRNA হচ্ছে DNA অণুর একটি অংশের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তাহলে বোঝা যায় প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম পরোক্ষভাবে DNA দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

আদি কোষে নিউক্লিয়াস না থাকায় একই সাথে এক প্রান্তে mRNA-র ট্রান্সক্রিপশন চলতে থাকে এবং অপর প্রান্তে ট্রান্সলেশন ঘটতে পারে।

প্রোটিন বড় অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ, তবে মাত্র ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্রমে সজ্জিত হয়ে বড় বড় প্রোটিন অণু গঠন করে। দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন এর মধ্যে পার্থক্য

ট্রান্সক্রিপশন	ট্রান্সলেশন
১। DNA অণুতে গ্রথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA (mRNA) অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন।	১। mRNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সলেশন।
২। এক্ষেত্রে ATP, GTP CTP ও UTP উপকরণগুলো ব্যবহৃত হয়।	এক্ষেত্রে সাধারণত 20টি অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।
৩। এ প্রক্রিয়াটি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।	২। এ প্রক্রিয়াটি সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। (mRNA নিউক্লিয়ার রন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজমে আসে।)
৪। ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি রাইবোসোমের সাথে সম্পর্কিত নয়।	৩। এক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটি কোষের রাইবোসোমের সাথে সংশ্লিষ্ট।
৫। এ প্রক্রিয়ায় RNA পলিমারেজ এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	৪। এ প্রক্রিয়ায় অ্যাকটিভেটিং এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৬। প্রোমোটারে সংযুক্ত হওয়ার পর RNA পলিমারেজ প্রথমে DNA-এর পাক খুলে নেয়।	৫। এনজাইমে tRNA এর সাথে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তির পর AMP বের হয়ে যায় এবং পরে এনজাইমে মুক্ত হয়।

জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় (Central Dogma of Biology) : রেপ্লিকেশন (Replication), ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) ও ট্রান্সলেশন (Translation) এর মাধ্যমে DNA ও RNA এবং প্রোটিন এর মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্কটি হচ্ছে- এদের একটি থেকে অন্যটির উৎপাদন (চিত্র ১.৩৬)। DNA থেকে RNA উৎপাদন, RNA থেকে প্রোটিন উৎপাদন এবং প্রোটিন (এনজাইম) দ্বারা DNA ও RNA উভয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ- এই হচ্ছে এ সম্পর্কের মূল কথা। এ ধারণা বা প্রত্যয়টি জীববিজ্ঞানের একটি মৌল প্রত্যয় (Dogma)। এ কারণে এ প্রত্যয়কে বলে জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় (Central Dogma of Biology)। ওয়াটসন কর্তৃক ১৯৫৮ সালে প্রস্তাবিত এ কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিকে ১৯৬৮ সালে কমনার (Barry Commoner) চাক্রিক (cyclic) রূপ দান করেন। ১৯৭০ এর দশকে জানা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে RNA থেকে DNA তৈরি হতে পারে। এর নাম রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন (Reverse Transcription)। HIV-তে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন হয়।

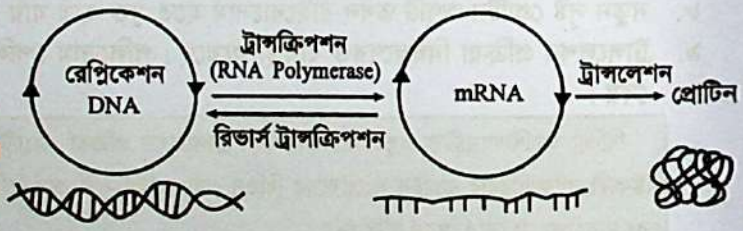

চিত্র ১.৩৬ : জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।

রেপ্লিকেশন : DNA → DNA
ট্রান্সক্রিপশন : DNA → RNA
রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন : RNA → DNA
ট্রান্সলেশন : RNA → Protein

জিন (Gene)

ছেলেটি তার বাবার বুদ্ধিমত্তা পেয়েছে বা মেয়েটি তার মায়ের চুল ও চোখ পেয়েছে, এমন কথা আমরা বলতে শুনি, বাস্তবে এমনটি দেখেও থাকি। কিন্তু কেমন করে কার মাধ্যমে বাবা বা মা থেকে তাদের ছেলে-মেয়েতে বৈশিষ্ট্যগুলো স্থানান্তরিত হলো? একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকেই ঐ ছেলেটি বা মেয়েটির জীবন শুরু হয়েছে। ঐ নিষিক্ত ডিম্বাণুতে না ছিল বাবার বুদ্ধিমত্তা, না ছিল মায়ের চোখ বা চুল কিন্তু এমন কিছু ছিল যা পরবর্তীতে মায়ের চোখের গড়ন, চুলের বৈশিষ্ট্য বা

বাবার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। যার মাধ্যমে মা-বাবা থেকে ছেলে-মেয়েতে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো এসেছে তার নামই জিন। বংশগতির মূল একক জিন। অর্থাৎ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম একককে জিন বলা হয়।

গ্রেগর যোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1822–1884) মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণা করা কালে (১৮৬০ এর দশকে) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের বাহককে কণা বা ফ্যাক্টর বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে যোহানসেন (Johannsen) ১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম ঐ কণা বা ফ্যাক্টরকেই জিন (gene) হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯১২ সালে T. H. Morgan প্রমাণ করেন যে, জিন কোষের ক্রোমোসোমে অবস্থিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী **Har Gobinda Khorana** কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ করে ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ক্রোমোসোমের যে স্থানে একটি জিন অবস্থান করে ঐ স্থানকে লোকাস (locus) বলে। কিন্তু জিন কী?

বীডল এবং ট্যাটাম (George Beadle and Edward L. Tatum- 1941) *Neurospora crassa* নামক ছত্রাক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর বলেন যে, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট এনজাইম তৈরির জন্য দায়ী। এর মাধ্যমেই বিজ্ঞানী Garrool (1908) সর্বপ্রথম 'এক জিন এক এনজাইম' মতবাদ চালু করেন। এর আগে থেকেই জানা ছিল এনজাইম মানেই প্রোটিন, তাই পরবর্তীতে উক্ত মতবাদ পরিমার্জন করে বলা হয় 'এক জিন এক পলিপেপটাইড চেইন'। অর্থাৎ এনজাইম এবং প্রোটিন অণু জিন কর্তৃক সৃষ্ট।

সিক্‌ল সেল হিমোগ্লোবিন (৬০০ অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত) নিয়ে কাজ করে Vernon Ingram (১৯৫৯) দেখান যে, এই প্রোটিনে ৬০০ অ্যামিনো অ্যাসিড একটি নির্দিষ্ট সাজ (sequense) অনুযায়ী সজ্জিত। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে অ্যামিনো অ্যাসিডের ভিন্ন ভিন্ন সাজ পদ্ধতির জন্যই বহু বৈচিত্র্যময় এনজাইম তৈরি হয় এবং এক একটি এনজাইম এক একটি সুনির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দায়ী। তাই প্রোটিনকে বলা হলো জীবনের ভাষা (Language of life)।

ক্রোমোসোমে, বিশেষ করে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে প্রোটিন এবং DNA দু'টোই থাকে, এর কোন্‌টি জিন ?

Pneumococci নিয়ে গবেষণা করে Frederick Griffith দেখেন যে, এর ভাইরুলেন্ট প্রকরণের ক্যাপসুল সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তরযোগ্য। পরে O.T. Avery প্রমাণ করেন যে, এই ব্যাকটেরিয়ার ক্যাপসুল (দেহের চারদিকে পুরু আবরণ) তৈরির বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয় DNA দিয়ে। কাজেই বোঝা গেল DNA-ই হচ্ছে জিন।

আধুনিক ধারণা মতে, জিনকে বিভিন্ন একক রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন-রেকন, মিউটন, রেপ্লিকন ও সিস্ট্রন।

১। রেকন (Recon) : এটি জিন রিকম্বিনেশন এর একক, DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম একক জেনেটিক রিকম্বিনেশনে অংশ গ্রহণ করে তাকে রেকন বলে। রেকন এক অথবা দুই জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত।

২। মিউটন (Muton): একে জিন মিউটেশনের একক বলা হয়। DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম অংশে মিউটেশন সংঘটিত হয়, তাকে মিউটন বলে। এক বা একাধিক নিউক্লিয়োটাইড যুগল নিয়ে মিউটন গঠিত হয়ে থাকে।

৩। রেপ্লিকন (Replicon) : DNA-এর যে অংশ DNA-এর অনুলিপন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রেপ্লিকন বলে অর্থাৎ রেপ্লিকেশন এর একক।

৪। সিস্ট্রন (Cistron) : জিন কার্যের একক। DNA অণুর যে খণ্ডাংশ কোষীয় বস্তুর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সিস্ট্রন বলে। *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি সিস্ট্রনে প্রায় ১৫০০টি নিউক্লিয়োটাইড যুগল থাকে। প্রতিটি সিস্ট্রনে অনেক রেকন ও মিউটন থাকে। তাই রেকন ও মিউটন অপেক্ষা সিস্ট্রনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিন ও সিস্ট্রন প্রায় সমতুল্য (equivalent) অর্থ বহন করে।

জিন হলো ক্রোমোসোমের লোকাসে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স যা জীবের একটি নির্দিষ্ট 'কার্যকর সংকেত' আবদ্ধ (encode) করে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। অন্যভাবে বলা যায়, জিন ক্রোমোসোমস্থ DNA-এর একটি অংশ যা একটি কর্মক্ষম পলিপেপটাইড শিকল গঠনের উপযুক্ত বার্তা বহন করে।

জিনের বৈশিষ্ট্যাবলি

i. জিন নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত।

ii. এরা প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমে অবস্থান করে এবং আদি কোষের নিউক্লিয় বস্তু বা প্লাসমিডে অবস্থান করে।

iii. এটি জীবের প্রকরণ (variety) এবং পরিব্যক্তিতে (mutation) মুখ্য ভূমিকা রাখে।

iv. জিন জীবের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে বহন করে।

v. জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন দায়ী।

কোনো প্রজাতির কোষে বিদ্যমান সকল ধরনের এক সেট ক্রোমোসোমে বিদ্যমান সকল জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী **Hans Winkler** ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম জিনোম শব্দটি ব্যবহার করেন। মানব জিনোমে প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন ক্ষারক-যুগল (base pairs) থাকে যা 24 (22A + 1X + 1Y) টি ক্রোমোসোমে বণ্টিত থাকে। সব মানুষের জিনোমের গঠন ৯৯.৯ ভাগ একই রকম। জিনের গঠনের ০.১ ভাগ ভিন্নতার কারণে বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে X ক্রোমোসোমে সবচেয়ে বেশি (২৯৬৮টি) জিন থাকে এবং Y ক্রোমোসোমে সবচেয়ে কম (২৩১টি) জিন থাকে। মানব জিনোমে মাত্র ২ ভাগ জিন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে। বাকি ৯৮ ভাগ জিনই নিষ্ক্রিয় থাকে। এদের **জাঙ্ক DNA** (junk DNA) বলে। মানুষের জিনোমের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনোমের ৯৮ ভাগ এবং গরিলা জিনোমের ৯৭ ভাগ মিল রয়েছে।

জিনের প্রকৃতি : যে কোনো জিনেই মিউটেশন ঘটতে পারে যার মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও বংশপরম্পরায় স্থানান্তরযোগ্য নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো একাধিক জিন মিলে একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- মানুষের উচ্চতা। কখনো কখনো একটি জিন অন্য জিনের প্রকাশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে, অনেক জিনের প্রকাশ পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিয়ামক দ্বারা জিনের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। জিনের বড় ধরনের পরিবর্তন জীবের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। প্রকৃতকোষী জীবের জিনে কোডিং ও নন-কোডিং অংশ থাকে। এদেরকে যথাক্রমে এক্সন (exon) ও ইন্ট্রন (intron) বলে। কেবল এক্সন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

একটি স্তন্যপায়ী জীবের কোষে ৫০,০০০ এর অধিক জিন থাকতে পারে। প্রতিটি জিন একটি সুনির্দিষ্ট DNA অংশ নিয়ে গঠিত এবং এর নিউক্লিয়োটাইড সংখ্যা ও অনুক্রমও সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট ক্ষারক অনুক্রম সুনির্দিষ্ট তথ্য বা সংকেত নির্দেশ করে। এ পর্যন্ত হিসাবকৃত ক্ষুদ্রতম জিনে ৭৫টি নিউক্লিয়োটাইড এবং বৃহত্তম জিনে ৪০,০০০টি নিউক্লিয়োটাইড রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রকৃতকোষী জীবের বিশেষ করে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখির জিনের সংকেত বহনকারী এক্সন (exon) মাঝে মধ্যে সংকেতবিহীন ইন্ট্রন (intron) অংশ লক্ষ্য করা যায়। এমন ধরনের জিনকে স্প্লিট জিন (split gene) বলে। হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্টের তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে মানুষের জিনোমে ২৯০০ মিলিয়ন নিউক্লিয়োটাইড এবং প্রায় ৩০,০০০ হাজার জিন এর উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে।

* ল্যাক্টোজ অপেরনের গাঠনিক জিন তিনটি আর ট্রিপ্টোফ্যানের গাঠনিক জিন পাঁচটি।
* শিকল সেল হিমোগ্লোবিন ৬০০টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত।
* ড্রসোফিলা নামক মাছির চোখের রঙ প্রায় ২০টি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
* অ্যালবিনো (Albino) মানুষের দেহের চামড়া, চুলের রঙ ইত্যাদি একটি মাত্র জিনের মিউটেশনের ফলে সৃষ্টি হয়।
* কোনো কোনো ভাইরাসের জিন (যেমন- উদ্ভিদ ভাইরাস) RNA দিয়ে গঠিত।

আদি কোষে জিন প্রকাশ : জিন ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যার জন্য Jacob & Monad (1961) 'অপেরন মডেল' প্রস্তাব করেন। আদি কোষে (eg. *E. coli*) জিন প্রকাশের ইউনিটকে বলা হয় **operon** (অপেরন)। চারটি অংশ নিয়ে অপেরন গঠিত হয়। অংশ চারটি হলো—

১। **গাঠনিক জিন (Structural gene) :** যা এনজাইম সংশ্লেষ করে।

২। **প্রোমোটার বা উদ্দীপক জিন (Promoter gene) :** যেখানে RNA-পলিমারেজ এনজাইম সংযুক্ত হয়।

৩। **অপারেটর বা চালক জিন (Operator gene) :** চালক জিন গাঠনিক জিনের প্রোটিন উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। **রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক জিন (Regulator gene) :** যা অপারেটর জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

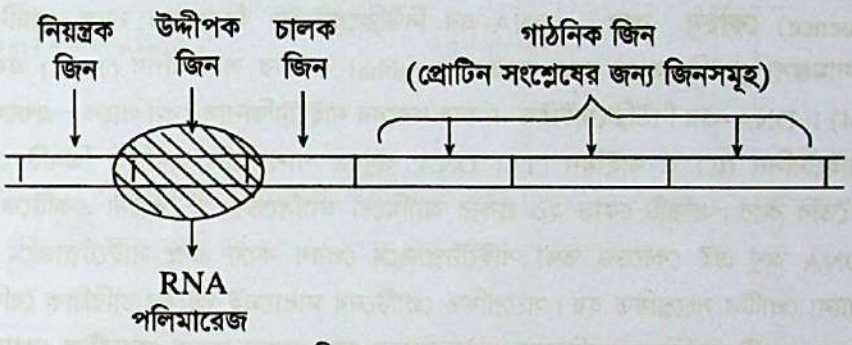

চিত্র ১.৩৭ : অপেরন।

প্রতিটি আদিকোষী জীবে একাধিক অপেরন থাকে, যেমন- ল্যাক্টোজ অপেরন, ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন ইত্যাদি। ল্যাক্টোজ অপেরন ক্রিয়াশীল হয় ল্যাক্টোজ-এর উপস্থিতিতে। আর ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন কর্মশীল হয় ট্রিপ্টোফ্যান না থাকলে। ল্যাক্টোজ অপেরনের গাঠনিক জিন তিনটি আর ট্রিপ্টোফ্যানের গাঠনিক জিন পাঁচটি। গাঠনিক জিনসমূহ এক সাথে পরপর থাকে এবং সবাই মিলে একই mRNA ট্রান্সক্রাইব করে। রেগুলেটর জিন অনেক সময় **রিপ্রেসর** প্রোটিন তৈরি করে যা ট্রান্সক্রিপশনে বাধা প্রদান করে, তখন অপেরন কর্মশীল থাকে না।

প্রকৃত কোষে জিন প্রকাশ : জীবদেহের সকল তথ্য জিন তথা DNA-তে সংরক্ষিত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে এসব তথ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় জিন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে তাকে **জিনের ক্রিয়া** (action of gene) বলে। প্রকৃত কোষে জিন প্রকাশ ঘটে যথাক্রমে (i) ট্রান্সক্রিপশন, (ii) mRNA প্রসেসিং, (iii) ট্রান্সলেশন, (iv) ট্রান্সলেশন পরবর্তী প্রসেসিং এবং (v) ফিড ব্যাক (feed back) ইনহিবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোমে 'অপেরন' এর জিন ক্রিয়া-কৌশল চিত্রে দেখান হয়েছে। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমোসোমস্থ জিনের ক্রিয়া-কৌশল অপেক্ষাকৃত জটিল। ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয়, হেটারোক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয় না।

আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের জিনগত কিছু পার্থক্য নিম্নরূপ

(i) আদি কোষে 'অপেরনের' মাধ্যমে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন ট্রান্সক্রাইব হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কোষে জিনসমূহ সাধারণত পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে। কাজেই প্রতিটি জিন-এ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। হরমোন-এ সাড়া দেয়া বিভিন্ন জিন (পৃথক পৃথকভাবে দূরে দূরে অবস্থিত) তাদের প্রোমোটারের কাছে বিশেষ সিকোয়েন্স-এর হরমোন রেস্পন্স এলিমেন্ট (Hormone response element) থাকে।

(ii) ব্যাকটেরিয়া তথা আদি কোষে এক প্রকার RNA পলিমারেজ এনজাইম থাকে কিন্তু প্রকৃত কোষে ভিন্ন তিন প্রকার RNA পলিমারেজ এনজাইম থাকে। বিভিন্ন ধরনের পলিমারেজ বিশেষ ধরনের বিশেষ বিশেষ জিনকে ট্রান্সক্রাইব করে।

(iii) আদি কোষে একটি পেপটাইড সাবইউনিটের সহায়তায় RNA পলিমারেজ প্রোমোটারকে পুনঃক্রিয়াশীল করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিপশনের সূচনা পর্বে বহু প্রোটিন সম্পৃক্ত হয়।

(iv) প্রকৃত কোষে প্রোমোটার বহু ধরনের হয়।

জেনেটিক কোড (Genetic code)

কোড অর্থ হলো গোপন সংকেত বা গোপন বার্তা। জেনেটিক তথ্যের মূল একক হলো কোডন। আমরা জানি যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য এক বংশধর থেকে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। এক ধরনের কোড তথা গোপন সংকেতের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের এই স্থানান্তর ঘটে থাকে। জীবের বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরকারী কোডকে বলা হয় জেনেটিক কোড। DNA-তে এই কোড অবস্থিত। আর তিনটি করে নিউক্লিয়োটাইডের একেকটি বিশেষ বিন্যাস বা ট্রাইনিউক্লিয়োটাইডের অনুক্রমকে (sequence) কোডন বলে। DNA-এর নিউক্লিয়োটাইড বিন্যাসের সাথে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড বিন্যাসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করেন Sarabhai ও তাঁর সহকর্মীগণ (1964) এবং Yanoklei ও তাঁর সহকর্মীগণ (1964)। DNA-এর নিউক্লিয়োটাইড-এ চার ধরনের নাইট্রোজিনাস বেস থাকে। এগুলো হলো অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)। DNA অণুতে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি বেস মিলিতভাবে একটি জেনেটিক কোড তৈরি করে। প্রতিটি কোড ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের যে কোনো একটিকে নির্দেশ করে। mRNA সৃষ্টির মাধ্যমে DNA অণু এই কোডেড তথ্য সাইটোপ্লাজমে প্রেরণ করে এবং সাইটেপ্লাজমে কোডের তথ্য অনুযায়ী এনজাইমসহ অন্যান্য প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। সংশ্লেষিত প্রোটিনের মাধ্যমেই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়। একাধিক কোড যখন একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে কোড করতে পারে তখন তাকে জেনেটিক কোডের অধোগামিতা বলে। কাজেই দেখা যায়, জেনেটিক কোড হলো নিউক্লিয়োটাইডের অনুক্রম (sequence) ও অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুক্রমের মধ্যে যোগাযোগের পদ্ধতি। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

DNA অণুতে পর্যায়ক্রমিকভাবে সজ্জিত প্রতি তিনটি নিউক্লিয়োটাইড-এর মধ্যে একটি গোপন কোড (সংকেত) নিহিত থাকে। DNA অণু থেকে যখন mRNA ট্রান্সক্রাইব হয় তখন এই গোপন সংকেত mRNA অণুতে চলে আসে। DNA-এর তিনটি নিউক্লিয়োটাইডের বিপরীতে যে তিনটি কমপ্লিমেন্টারি নিউক্লিয়োটাইড mRNA অণুতে সজ্জিত হয় এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ট্রিপলেট (triplet)। ফ্রান্সিস ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রমাণ করেন যে, জেনেটিক কোড তিন অক্ষর বিশিষ্ট বা ট্রিপলেট কোড। mRNA অণুর এই ট্রিপলেটকে বলা হয় কোডন (codon)। Nirenberg ও Matthaei সহকর্মীরা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য ৬৪ ধরনের ট্রিপলেট কোড আবিষ্কার করেন। প্রতিটি ট্রিপলেট একটি সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে। এই নির্দেশিত অ্যামিনো অ্যাসিড tRNA এর মাধ্যমে পলিপেপটাইড চেইন-এ সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরিতে অংশ নেয়। tRNA-তে তিনটি নিউক্লিয়োটাইডের যে ট্রিপলেট mRNA-এর সম্পূরক ট্রিপলেটের সাথে (কোডনের সাথে) সংযুক্ত হতে পারে তাকে বলা হয় অ্যান্টিকোডন (anticodon)। কোডনগুলো RNA গঠনকারী চারটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস-এর প্রতিনিধিত্বকারী অক্ষরের মাধ্যমে (A = অ্যাডিনিন; U = ইউরাসিল; C = সাইটোসিন; G = গুয়ানিন) প্রকাশ করা হয়। এই চারটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস লেটার (A, U, C, G) বিভিন্ন কম্বিনেশনে ($4 \times 4 \times 4 = 64$ ধরনের) ৬৪টি কোড তৈরি করে। এর মধ্যে তিনটি কোড (UAA, UAG, UGA) কোনো অ্যামিনো-অ্যাসিডকে নির্দেশ করে না, বরং ট্রান্সলেশন বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে। এদের উপস্থিতিতে প্রোটিন সংশ্লেষণের সমাপ্তি ঘটে। এজন্য এ তিনটি কোডকে (UAA, UAG ও UGA) সমাপ্তি কোডন (nonsence code) বলে। বাকি ৬১টি কোড-এর প্রতিটি কোনো না কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে। ৬১টি কোডের মধ্যে AUG (মেথিওনিন) ট্রান্সলেশন শুরু করার কোডন (starting codon)। এটি ট্রান্সলেশন শুরু করার নির্দেশ প্রদান করে এবং অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিন নির্দেশ করে। কোড-এর ভাষা একমুখী, নিউক্লিক অ্যাসিড → প্রোটিন।

কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কোড থাকলেও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড ২, ৩, ৪টি এমনকি ৬টি পর্যন্ত কোড দিয়ে নির্ধারিত হয়। যেমন-লাইসিন-এর জন্য ২টি, ভ্যালিন-এর জন্য ৪টি, আবার আরজিনিন-এর জন্য ৬টি কোড থাকে। ১৯৬৬ সালে জেনেটিক কোডের সম্পূর্ণ অর্থ জানা সম্ভব হয়। জেনেটিক কোডের পাঠোদ্ধারের জন্য নিরেনবার্গ ও হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৯ সালে।

mRNA কোডনের স্বরূপ

কোডনের দ্বিতীয় অক্ষর

কোডনের প্রথম অক্ষর	U	C	A	G	কোডনের তৃতীয় অক্ষর
U	UUU, UUC — ফিনাইল অ্যালানিন UUA, UUG — লিউসিন	UCU, UCC, UCA, UCG — সেরিন	UAU, UAC — টাইরোসিন UAA, UAG — বন্ধের নির্দেশ	UGU, UGC — সিস্টিন UGA — বন্ধের নির্দেশ UGG — ট্রিপটোফেন	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG — লিউসিন	CCU, CCC, CCA, CCG — প্রোলিন	CAU, CAC — হিস্টিডিন CAA, CAG — গ্লুটামিন	CGU, CGC, CGA, CGG — আরজিনিন	U C A G
A	AUU, AUC, AUA — আইসো-লিউসিন AUG — শুরুর নির্দেশ মেথিওনিন	ACU, ACC, ACA, ACG — থ্রিওনিন	AAU, AAC — অ্যাসপারাজিন AAA, AAG — লাইসিন	AGU, AGC — সেরিন AGA, AGG — আরজিনিন	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG — ভ্যালিন	GCU, GCC, GCA, GCG — অ্যালানিন	GAU, GAC — অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড GAA, GAG — গ্লুটামিক অ্যাসিড	GGU, GGC, GGA, GGG — গ্লাইসিন	U C A G

* তিন দিক থেকে তিনটি অক্ষর মিলিতভাবে একটি কোডন তৈরি করে।

জেনেটিক কোডের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of genetic code)

১। একাধিক কোডন একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে কোড বা নির্দেশ করে (যেমন- লিউসিন)

২। একটি কোডন কখনো একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডকে কোড করে না।

৩। কোডন তৈরিতে নিউক্লিয়োটাইড (এখানে letter বা অক্ষর) কখনো অভারলেপ (overlap) করে না (non-overlapping) বরং ক্রমসজ্জা (sequence) অনুসরণ করে।

৪। কোডনসমূহ সার্বজনীন (universal) অর্থাৎ বিশ্বের সকল প্রজাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সেই আদিকাল থেকে শত বিবর্তন ধারা অতিক্রম করে এখনো একই রকম আছে।

৫। জেনেটিক কোড সর্বদা তিন অক্ষরবিশিষ্ট বা ট্রিপলেট কোড।

৬। শুরু ও সমাপ্তি কোড সুনির্দিষ্ট। কোডন AUG দিয়ে চেইন শুরু এবং কোডন UAA, UAG ও UGA দিয়ে চেইন সমাপ্তি বা শেষ হয়।

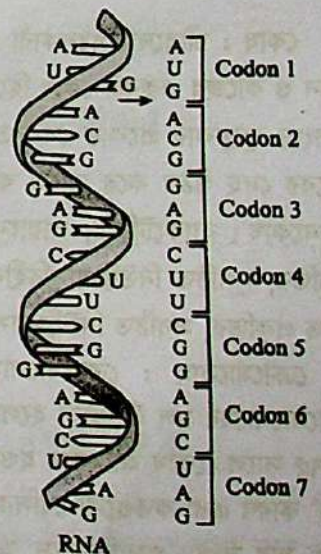

চিত্র ১.৩৮ : জেনেটিক কোড

৭। দুটি কোডের মধ্যে অতিরিক্ত নিউক্লিয়োটাইড থাকে না। আবার সমাপ্তি কোডন না আসা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তি চলতে থাকে।

সামান্য ব্যতিক্রম

মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে (এদের DNA আদি কোষ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়) এবং আদিকোষের কোডনের সাজানো পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কতক প্রোটিস্ট-এ UAA এবং UAG ট্রান্সলেশন বন্ধ করার নির্দেশ না দিয়ে বরং গ্লুটামিন কোড করে। এর ব্যাখ্যা এখনো জানা যায়নি, একে সার্বজনীন-এর সামান্য ব্যতিক্রমই ধরা হয়।

বংশগতি নির্ণয়ে DNA-এর ভূমিকা

আমরা জেনেছি মাতা-পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হওয়াকে বলে বংশগতি। বংশগতির ভিত্তি হলো বংশগতি বস্তু অর্থাৎ ক্রোমোসোম, DNA, RNA ইত্যাদি। কাজেই বংশগতি নির্ণয়ে এদের ভূমিকা সরাসরি।

DNA-এর ভূমিকা : এখন সর্বজন স্বীকৃত যে ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনই জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ DNA-ই জিন। DNA, ক্রোমোসোমের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ। কাজেই কেবলমাত্র DNA-ই বংশগতির বস্তু এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (chemical basis of heridity)। DNA-ই সরাসরি মাতা-পিতা হতে বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে বহন করে নিয়ে আসে।

তিনটি নিউক্লিয়োটাইড/বেস সিকুয়েন্স

নাম	কোথায় থাকে	কয়টি থাকে
ট্রিপলেট	DNA-তে	অসংখ্য
কোডন	mRNA-তে	অসংখ্য
অ্যান্টিকোডন	tRNA-তে	একটি মাত্র

সার-সংক্ষেপ

কোষ : জীবদেহ গঠনকারী একক হলো কোষ। জীবদেহের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুও কোষ। কাজেই জীবদেহের গঠন ও কাজের এককই কোষ হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে বোতলের কর্ক পরীক্ষাকালে তাতে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার প্রকোষ্ঠ দেখতে পান এবং ঐ প্রকোষ্ঠকেই নাম দেন Cell, যার বাংলা করা হয়েছে কোষ। যে কোষ জীবের দেহ গঠন করে তাকে বলা হয় দেহকোষ, আবার জনন কাজের জন্য সৃষ্ট শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে বলা হয় জননকোষ। ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবের কোষকে বলা হয় আদিকোষ, কারণ এদের কোষ আদি প্রকৃতির, সুগঠিত নিউক্লিয়াসবিহীন। পুষ্পক উদ্ভিদ, মানুষ ইত্যাদি জীবের কোষ হলো প্রকৃত কোষ, কারণ এদের কোষ উন্নত প্রকৃতির, সুগঠিত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।

ক্রোমোসোম : ক্রোমোসোম হলো কোষস্থ সূত্রাকার অঙ্গাণু যা সাধারণত নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত। ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো DNA, কাজেই ক্রোমোসোমই বংশগতির ধারক ও বাহক। ক্রোমোসোম আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৫ সালে (কোষ আবিষ্কার হওয়ার অনেক পরে) এবং নামকরণ করা হয় ১৮৮৮ সালে। ক্রোমোসোম অর্থ হলো 'রঞ্জিত দেহ' কারণ এরা কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে। প্রতিটি জীবপ্রজাতি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম বহন করে, যার সংখ্যা প্রজাতিভেদে $2n = ২$ থেকে $2n = ১৬০০$ পর্যন্ত জানা গেছে। প্রতিটি ক্রোমোসোমে কমপক্ষে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানভেদে ক্রোমোসোম প্রধানত চার প্রকার, যথা-মধ্যকেন্দ্রিক, উপ-মধ্যকেন্দ্রিক, উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক এবং প্রান্তকেন্দ্রিক। কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোম প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

DNA : ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডকে সংক্ষেপে DNA বলা হয়। প্রকৃতকোষের ক্রোমোসোমে অবস্থিত DNA সূত্রাকার। আদি কোষ এবং ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি অঙ্গাণুর (যদি থাকে) DNA বৃত্তাকার । প্রতিটি DNA অণু গঠিত হয় এক অণু পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, এক অণু ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজিনাস বেস দিয়ে। কোষ বিভাজনকালে ক্রোমোসোমের বিভক্তির আগে DNA সূত্রের দ্বিত্বন তথা প্রতিলিপন হয়। DNA অণুর প্রতিলিপিন হয় অর্ধসংরক্ষণশীল উপায়ে। DNA-এর ভৌত গঠন ঘুরানো সিঁড়ির মতো, দ্বিসূত্রক যা ডবল হেলিক্স হিসেবে পরিচিত।

RNA : রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত নাম RNA. সকল জীবকোষেই RNA থাকে। রাসায়নিকভাবে রাইবোজ শ্যুগার, নাইট্রোজিনাস বেস এবং ফসফেট নিয়ে RNA গঠিত। এটি সূত্রাকার এবং একসূত্রক। সাধারণত পাঁচ প্রকার RNA দেখতে পাওয়া যায়, যথা- tRNA, mRNA, rRNA, gRNA এবং মাইনর RNA। DNA-এর ছাঁচ থেকে mRNA ট্রান্সক্রিপ্ট হয় এবং প্রোটিন তৈরির ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। tRNA অ্যামিনো অ্যাসিডকে বহন করে mRNA এর ছাঁচের সাথে যুক্ত করে প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে। কিছু কিছু ভাইরাসে বংশগতির বস্তু হিসেবে RNA কাজ করে।

জিন : জিন হলো ক্রোমোসোমের লোকাসে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট অংশ যা জীবের একটি নির্দিষ্ট সংকেত আবদ্ধ করে রাখে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বংশপরম্পরায় স্থানান্তরতি হয়। প্রতিটি জিন-এ নিউক্লিওটাইড-এর সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। একটি জিনে ৭৫টি থেকে ৪০,০০০ পর্যন্ত নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে।

ট্রান্সক্রিপশন : DNA থেকে RNA তৈরি হয়। DNA থেকে RNA তৈরি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। সাধারণত প্রোটিন তৈরির জন্যই DNA তার অংশবিশেষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে RNA তৈরি করে। প্রোটিন তৈরির জন্য mRNA এবং tRNA জরুরি। tRNA অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে mRNA-কে প্রদান করে এবং DNA কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট বার্তা অনুযায়ী mRNA প্রোটিন তৈরি করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ডি-অক্সিরাইবোজের কয় নম্বর কার্বনে অক্সিজেন নেই?

(ক) ২ নং-এ (খ) ৩ নং-এ (গ) ৪ নং-এ (ঘ) ৫ নং-এ

২। ক্লোরোপ্লাস্টের বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) এরা সবুজ এবং খাদ্য তৈরি করতে পারে

(ii) লিউকোপ্লাস্ট হতে সৃষ্টি হয়

(iii) ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমের দেহের সকল কোষে এমন একটি উপাদান আছে যা বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৩। উদ্দীপকের উপাদানটির বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) দ্বিসূত্রক

(ii) নাইট্রোজেন বেসে ইউরাসিল থাকে

(iii) অনুলিপির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের উপাদানটিতে নাইট্রোজিনাস বেসগুলো কীভাবে সজ্জিত থাকে ?

(ক) A = T, G ≡ C (খ) A = T, C – G (গ) A = G, C – T (ঘ) C = T, A = G

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (ক)	৩। (খ)	৪। (ক)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে একটি অঙ্গাণু আছে যাকে শক্তি ঘর (Power house) বলা হয়। আবার শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে এমন একটি অঙ্গাণু যা প্রাণিকোষে নেই কিন্তু সাধারণত সবুজ উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়।

(ক) স্ব-গ্রাস বা অটোগ্রাস কী?

(খ) কোন অঙ্গাণুকে প্রোটিন তৈরির কারখানা বলে? এটি কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত?

(গ) উদ্দীপকের যে অঙ্গাণুটি শুধু উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় তার গঠন লেখ।

(ঘ) যে অঙ্গাণুটি উভয় কোষে পাওয়া যায় তার নাম লেখ এবং কেন তাকে শক্তি ঘর বলা হয় বিশ্লেষণ কর।

২। ডিনা ও কণা কোষের এমন একটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করছিল যা উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আলোচনার এক পর্যায়ে ডিনা বলল, 'এটি তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত যাতে এক বিশেষ ধরনের পলিস্যাকারাইড উপস্থিত থাকায় তা কোষকে বাইরের আঘাত থেকে সুরক্ষা করতে পারে।

(ক) গ্লাইকোক্যালিক্স কী?

(খ) প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?

(গ) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উক্ত অঙ্গাণুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(ঘ) উল্লেখিত পলিস্যাকারাইডটি উক্ত অঙ্গাণুটির গঠনে কিরূপ ভূমিকা রাখে?—বিশ্লেষণ কর।

৩। ড. নিজাম তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সূত্রাকৃতির কোষীয় অঙ্গাণু দেখিয়ে বললেন, "প্রতিটি উন্নত জীবে এটি উপস্থিত এবং এই অঙ্গাণুটির মাধ্যমেই বংশগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ পিতামাতা থেকে তার সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয়।"

(ক) জিন কী?

(খ) অপেরন (operon) বলতে কী বুঝ?

(গ) উক্ত অঙ্গাণুটির (শ্রেণিবিভাগ) প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

(ঘ) উক্ত অঙ্গাণুটিকে কোষ বিভাজনের নিয়ামক বলা হয়—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।